দাম : দশ টাকা

গণতন্ত্র সংকটগ্রস্ত—
একথা আর কেউ বলবেন
না আশা করি।— পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

কনভেনশনে উদ্বেগ প্রকাশ
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা
অস্তিত্বের সঙ্কটে। —পৃঃ ১৬

৭০ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।। ২৯ মাঘ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com

ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন নয় পরিবর্তনের হাওয়া বিজেপির পক্ষে

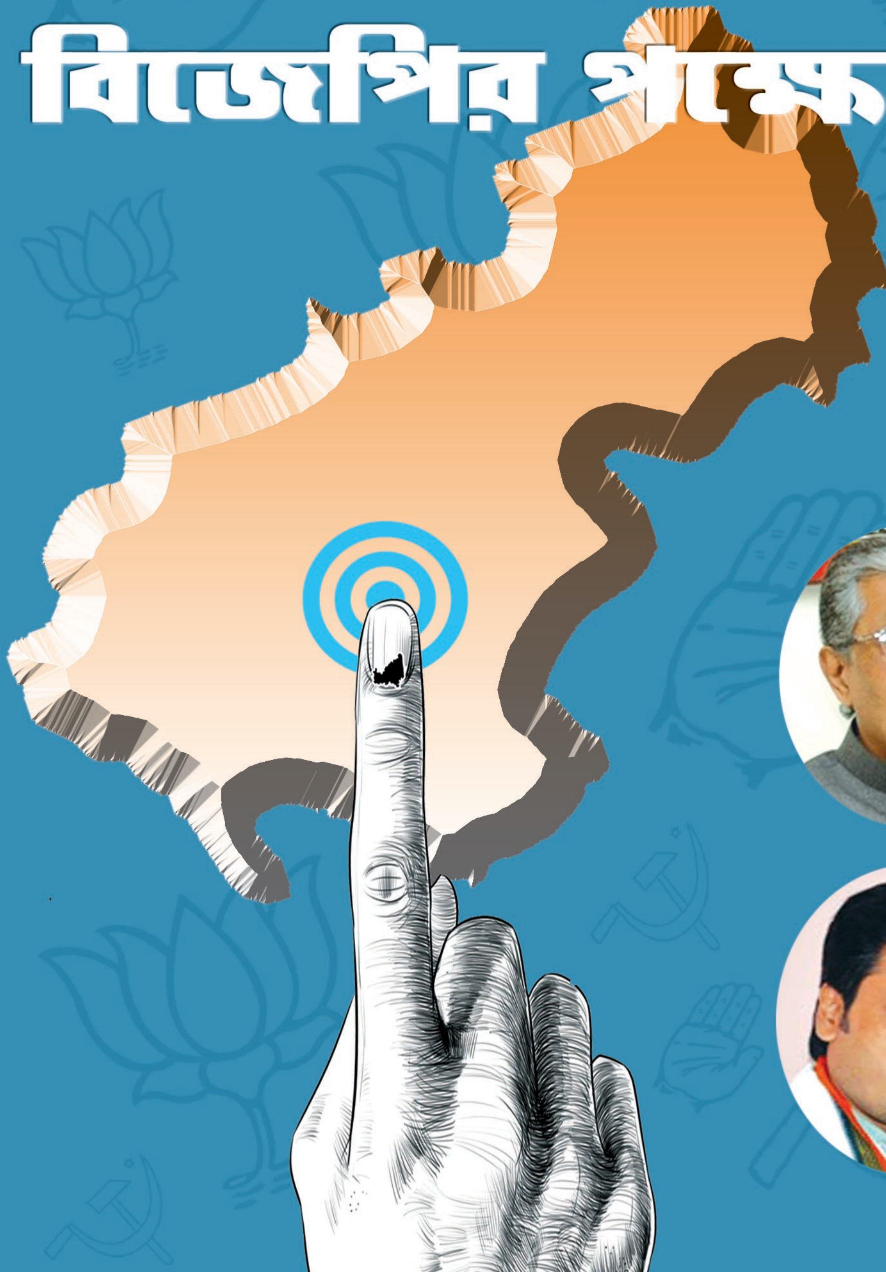

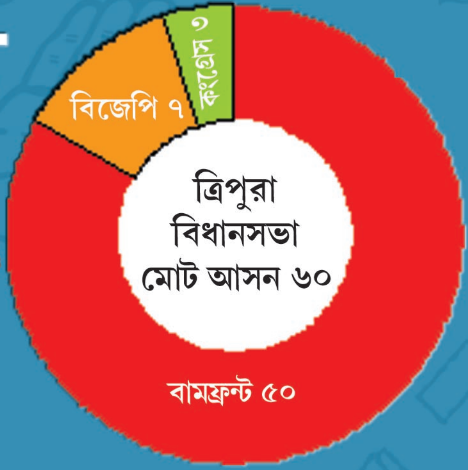

মানিক সরকার
সিপিএম
ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী

বিপ্লব কুমার দেব
বিজেপি
ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ২৯ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১২ ফেব্রুয়ারি - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

২০১৯-এর নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে ‘ওয়ান ইজ টু ওয়ান’ ফর্মূলা মমতার □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : চাপ নেবেন না দিদিভাই, মোদীভাইয়ের বই পড়ুন □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

গণতন্ত্র সংকটগ্রস্ত— একথা আর কেউ বলবেন না আশা করি □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

রোহিঙ্গা সমস্যায় চীন, পাকিস্তান, সৌদি আরবও দায়ী □ মানস ঘোষ □ ১৪

কনভেনশনে উদ্বেগ প্রকাশ : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা অস্তিত্বের সঙ্কটে □ ১৬

ত্রিপুরা ভাঙার অভিযোগ সি পি এমের ভাঁওতা □ গৌতম দত্ত □ ১৯

কমিউনিস্ট শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে জাতীয়তার জয়গান গাইবে ত্রিপুরা □ ইন্দ্র গুপ্ত □ ২০

দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যই উত্তর-পূর্ব ভারতে সাফল্য দরকার বিজেপির □ অভিমন্যু গুহ □ ২২

স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশ্ববাজার ধরতেই পারে ভারত □ দেবী শেঠি □ ২৭

শিবরাত্রি পালনের উদ্দেশ্য সকলের মঙ্গলকামনা □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

শ্রীরামকৃষ্ণ □ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত □ ৩৩

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : জয় কিষান, জয় জীবন □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ □ অন্যরকম : ৩৮ □ স্বজন বিয়োগ : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কেন্দ্রীয় বাজেট - ২০১৮

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি, গ্রামীণ বিকাশ, সমাজকল্যাণ এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের মতো একটি ক্ষেত্র চিরকালই আমাদের দেশে অবহেলিত। ৫ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প ঘোষণার মাধ্যমে বর্তমান সরকার দীর্ঘ সাত দশকের অচলায়তনে ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছে। বিরোধীরা অবশ্য খুশি নয়। তাদের দাবি, ভোটের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে বাজেট। এই অভিযোগের সারবত্তা আদৌ আছে কি? নাকি শুধুই গাত্রদাহ? এই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায়। সঙ্গে থাকবে বাজেটের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ। লিখবেন শেখর সেনগুপ্ত, পঙ্কজ রায়, অম্লানকুসুম ঘোষ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে — ১০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বাস্থ্যবিমার বিরোধিতা

নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ রাজীব কুমার ২০১৮-১৯-এর বাজেটে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যবিমার সমালোচনাকারীদের বক্তব্যকে খারিজ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন—এই বিমা যোজনা কার্যকর করিবার জন্য অর্থ বাধা হইয়া দাঁড়াইবে না। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, সাধারণ নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষা শুধু একটি জনকল্যাণমূলক কাজ নয়, সরকারের ইহা নৈতিক দায়িত্বও বটে। তাই এই প্রকল্প রূপায়ণে অর্থ কীভাবে আসিবে—এই প্রশ্ন না তোলাই ভালো। বরং কী উপায়ে আমাদের দেশের অধিকাধিক নাগরিক এই বিমা প্রকল্পের আওতাধীন হইতে পারে, ইহারই ভাবনাচিন্তা করা দরকার। শুধু তাহাই নয়, সাধারণ নাগরিক আরও কীভাবে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যই সচেষ্ট হইতে হইবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল দেশের বড় বড় শহরগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেখানে 'ফেল কড়ি মাখো তেল' নীতিরই রমরমা। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হইতেছে, অমুক হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু, লক্ষ লক্ষ টাকার বিল ধরাইবার ঘটনা। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা তো আরও শোচনীয়। মাঝে মধ্যেই রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে হাসপাতালের ডাক্তার তথা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদের ঘটনা ঘটিতেছে। সাধারণ মানুষ ধনেপ্রাণে মরিতেছে। বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী 'আয়ুষ্মান ভারত' শীর্ষক প্রকল্পে দেশের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাইবেন। বস্তুত এই ঘোষণা কার্যকর হইলে ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইবে। আমাদের দেশের কোনও সরকারই ইতিপূর্বে এই সাহস দেখাইতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপ্যুটস রিড্রেসাল কমিশন-এর রায় উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিখরচায় পরিষেবা পাইয়াছেন এমন রোগীও মামলা করিতে পারেন। বিনা খরচায় পরিষেবা পাইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে সঠিক পরিষেবা না দিলেও চলিবে এমন যে মানসিকতা আজ আমাদের সংস্কৃতিকে ক্রমশ গ্রাস করিতেছে, সেই দিক হইতেও এই রায় নিঃসন্দেহে এই প্রকল্পের পরিপূরক, আশাব্যঞ্জকও বটে।

ঘোষণা মতো এই প্রকল্পের ৬০ শতাংশ বহন করিবে কেন্দ্র আর ৪০ শতাংশ বহন করিবে রাজ্য। কোনও রাজ্য এই ব্যয়ভার বহন অস্বীকার করিলে সেই রাজ্যের নাগরিকরা এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন। অর্থাৎ ইহা 'কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র' বা রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা বলিয়া সোচ্চার হওয়া চলিবে না, বিশেষত আমাদের এই রাজ্যে। এই বিষয়ে তাই কেন্দ্র সরকারকে যেমন আরও অনেক কিছুই করিতে হইবে, তেমনই রাজ্য সরকারকেও। কেননা আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোটি তেমন মজবুত নয় এবং এই কারণে ইহার প্রতি আস্থাও কম। বেশিরভাগ মানুষ বাধ্য না হইলে সরকারি হাসপাতালে যান না। এমনকী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হাসপাতালগুলিও সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই নিয়ম নীতি মানিয়া চলে না। তাই এইসব হাসপাতালগুলির কর্তৃপক্ষ যাহাতে সরকারি নিয়মনীতি মানিয়া চলেন এবং তাহা অমান্য করিলে শাস্তি পাইবেন—এই বিষয়টিও নিশ্চিত করিতে হইবে। তাই যত শীঘ্র সম্ভব এই স্বাস্থ্যবিমা কার্যকর হয় ততই মঙ্গল। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা কোনও কাজের কথা নয়।

সুভাষিতম্

স্বকার্যে শিথিলো যঃ স্যাৎ কিমন্যেন ভবেদিহ।

জাগরুকঃ স্বকার্যে যঃ তৎসহায়াশ্চ তৎসমাঃ।।

যিনি স্বয়ং নিজের কাজে শৈথিল্য করেন তাঁর সহযোগী কেন কাজে উদাসীন থাকবে না? যদি ব্যক্তি নিজের কাজে সচেষ্ট থাকেন তাঁর সহযোগীও তাঁর মতোই আচরণ করবেন।

স্বামী লক্ষ্মণানন্দ হত্যা

সিবিআই তদন্তের দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী ওড়িশার বনবাসী সমাজের সংস্কৃতি, অস্মিতা ও সংস্কারের সংরক্ষক ছিলেন। তিনি বনবাসী সমাজের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাবলম্বন, সমাজ জাগরণ, ধর্মজাগরণ প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন সমর্পণ করেছিলেন। ২০০৮ সালে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর হত্যার ১০ বছর পরও বর্বর হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, ধর্মবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির কাজকর্ম আগের থেকে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ওড়িশার বনবাসী সমাজ রাজ্য সরকারের ব্যর্থতায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডল এই হত্যাকারীদের খুব দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে রাজ্যে সরকারের ব্যর্থতা বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে সিবিআই তদন্তের দাবি করেছে।

সেবার আড়ালে বনবাসী হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ খ্রিস্টান মিশনারিদের অনেক পুরানো ইতিহাস। তারা অশিক্ষিত, গরিব ও সরল বনবাসীদের ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে কেবল ধর্মান্তরিতই করে না, তাদের জমিও দখল করে সামাজিক সংঘর্ষ ও অসন্তোষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। স্বামী লক্ষ্মণানন্দের কারণে মিশনারিদের চক্রান্ত স্বাভাবিকভাবে ফাঁস ও বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এজন্য তাদের রাস্তার কাঁটা দূর করার জন্য তাঁর উপর বেশ কয়েকবার প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল। তার মধ্যে ২০০৬ সালে ২৩ ডিসেম্বর ভয়ানক হামলা হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তিনি বেঁচে যান।

এরপর সামাজিক চাপে তদন্ত করার জন্য 'পাণিগ্রাহী কমিশন' তৈরি হয়। কিন্তু তার রিপোর্ট আসার আগেই ২০০৮ সালের জন্মাষ্টমীর দিন ছাত্রাবাসে ছোট ছোট বাচ্চাদের সামনেই স্বামীজীর উপর আবার মারাত্মক হামলা হয় এবং তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সরকারি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

ওড়িশার হিন্দু সমাজ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সরকারি দমন-পীড়ন সত্ত্বেও হিন্দু সমাজ এই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে শামিল হয়। বনবাসী সমাজের শত শত বন্ধু ও হিন্দু সংগঠনের কার্যকর্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। তৎকালীন রাজ্য সরকার খুবই স্পষ্টভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ নিয়ে হিন্দু সমাজের উপর দমন-পীড়ন চালাতে থাকে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে যে, ওই সময় হিন্দু সমাজের উপর আরোপিত সব মামলা যেন তুলে দেওয়া হয়।

স্বামীজী হত্যার পর ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্তের নামে নাটক শুরু করে। রাষ্ট্রব্যাপী আন্দোলনের ফলে নাইডু কমিশন গঠন হয়। লোককে দেখানোর জন্য কিছু ব্যক্তিকে সাজাও দেওয়া হয়; কিন্তু মুখ্য ষড়যন্ত্রকারী ও অপরাধীরা ১০ বছর পরও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে এখন তাদের সাহস আরও বেড়ে গেছে।

ওড়িশার বনবাসী হিন্দু সমাজ এক ভয়ের পরিবেশে দিন যাপন করছে। তাদের বিশ্বাস, খ্রিস্টান মিশনারিদের এই ষড়যন্ত্রে সরকারি মদত অবশ্যই রয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডল ওড়িশা সরকারের কাছে দাবি করেছে যে, স্বামীজীর হত্যার উপর যে দুটি কমিশন গঠন হয়েছিল (পাণিগ্রাহী ও নাইডু কমিশন) তাদের রিপোর্ট সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হোক। ২০০৬ সালের আক্রমণে দোষীদের যদি তখন সাজা দেওয়া হতো তাহলে ২০০৮-এ হত্যাকাণ্ড হতো না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর দায় এড়িয়ে যেতে পারে না ওড়িশা সরকারও।

এজন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী হত্যাকাণ্ডের সিবিআই তদন্তের দাবি করেছে, যাতে প্রকৃত হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া যায়। হিন্দু সমাজ ও দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রকারী এই শক্তিকে অবিলম্বে শাস্তি দিয়েই বনবাসী সমাজের আক্রোশকে প্রশমিত করা সম্ভব তথা ওড়িশার মতো শান্তিপ্রিয় ও ধর্মপ্রেমী রাজ্যকে মিশনারি ও রাষ্ট্রবিরোধী ধর্মবিরোধী ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত করা সম্ভব। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ওড়িশার ধর্মপ্রেমী সমাজকে আহ্বান জানিয়েছে যে, খ্রিস্টান মিশনারিদের এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করুন, যাতে ভগবান জগন্নাথের এই পবিত্র ভূমির পবিত্রতা ও সুরক্ষা বজায় থাকে।

আই সি এইচ আর-এর প্রেরণায় ইতিহাস সংকলন যোজনার রাষ্ট্রীয় সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা কৃষ্টি, জ্ঞানের প্রতীক বৈদিক সভ্যতা যে খ্রিস্টপূর্ব ২ হাজার বছর আগে আজকের লুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরেই পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করত সেই সত্যটিকে অস্বীকার করতে শক্তিশালী চক্র সদা সক্রিয়। ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির তেলেঙ্গানা শাখা সরস্বতী নদীর ওপর সাম্প্রতিকতম গবেষণা, হরিয়ানা সরকারের প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্যাটেলাইট চিত্র ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠিত Saraswati Heritage Development Board (SHDB)-এর কার্যকলাপ ইত্যাদি একত্রিত করে একটি বড় মাপের সর্বভারতীয় সেমিনারের আয়োজন করেছিল হায়দরাবাদের রাজেন্দ্রনগর এলাকায়। স্থানীয় কোঅপারেটিভ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিশাল প্রেক্ষাগৃহ ও ছাত্রাবাসগুলিতে একত্রিত হয়েছিলেন সারা ভারতের প্রতিনিধিরা। তৈরি হয়েছিল একটি ক্ষুদ্রাকারে ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসচর্চার সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ (আই সি এইচ আর) ছিল এই জাতীয় সেমিনারের মূল প্রেরণাদাতা ও সহায়ক। বক্তাদের মধ্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সরস্বতী নদী গবেষণায় স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়েছিলেন ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি দু'দিনের এই অধিবেশনে। এই গবেষণা চর্চা বিভক্ত ছিল চারটি পর্বে। প্রথমদিন অধিবেশনের আহ্বায়ক ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ভি. কিষাণরাও তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে 'River Saraswati through the Ages' ঋক বেদের এই পূজিতা নদীর ওপর আরও বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ওয়ার্কশপ, উদ্ভাবনী গবেষণাপত্র পাঠের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সরস্বতীর অস্তিত্ব যে আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সে বিষয়ে তিনি SHDB কৃত পরিসংখ্যান— ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০ মিটার নিচে অবস্থান, ৩-১৫ মিটার চওড়া ও ১৫০০ মাইল গতিপথে প্রবাহিত ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেশ করেন। ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার সর্বভারতীয় সভাপতি তথা অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক সতীশ মিত্তল ১৯৬৯ সালে কামকোটী শঙ্করাচার্যের সরস্বতীর গতিপথ ধরে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছনোর তথ্য তুলে ধরেন।

ICHR-এর ভূতপূর্ব সভাপতি সুদর্শন রাও সরস্বতীর ব্রহ্মার কন্যা বা স্ত্রী হওয়ার পৌরাণিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। ব্রহ্মপুত্র নদীর সৃষ্টিও এই সরস্বতীর স্রোতধারা। একই সঙ্গে অদ্বৈতবাদের প্রসঙ্গও আসে। অনুষ্ঠান পরিচালন সমিতির চেয়ারপার্সন ছিলেন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও-কন্যা শ্রীমতী বাণীদয়াকর রাও। তাঁর বক্তব্যেও ছিল একই সুর।

ICHR-এর বর্তমান সদস্য-সম্পাদক রজনীশ শুক্লা জানান, আজকের নদী গবেষকরা বৈজ্ঞানিক তথ্য অস্বীকার করে পূর্ব-ধারণার বশবর্তী হয়ে সমগ্র এশিয়া অঞ্চলে একদা প্রবাহিত বৈদিক ও আর্যাবর্তের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই নদীটির অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চান। এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিকল্পনা, কেননা তাহলেই অশিক্ষিত কালো মানুষদের দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ আর্যরা এসে সভ্য করেছিল এ তথ্য মান্যতা পাবে।

সেমিনারের মুখ্য বক্তা বিদগ্ধ পণ্ডিত ড. কল্যাণ রমন তাঁর দীর্ঘ গবেষণাপত্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করে এই নদীর তীরে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা একদিন পূর্ণ গরিমায় যে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা নানা প্রামাণিক তথ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। হিমালয়ের উৎস থেকে হ্যানয় ভিয়েতনাম হয়ে ইরান পর্যন্ত এই নদীর ৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ গতিপথের তথ্য তুলে ধরেন তিনি। সম্মেলনে অন্যান্য বিশিষ্ট সকল বক্তাই সরস্বতী নদী-চর্চার ওপর গুরুত্ব দেন। এদিনের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল সর্বভারতীয় প্রাদেশিক ইতিহাস সঙ্কলন সমিতিগুলির কার্য বিবরণী পেশের পালা। এই পর্বটি গভীর মনযোগের সঙ্গে শোনেন ড. বালমুকুন্দ পাণ্ডে। পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফে সম্পাদক অমিতাভ সেন সমিতির বিগত বছরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে, স্যার আশুতোষ বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আয়োজন করার সঙ্গে সঙ্গে সদস্য সংখ্যা ১২৫-এ পৌঁছনোর তথ্য অবগত করান। শ্রী সেন চলতি বছর থেকে সম্প্রতি বন্ধ হয়ে থাকা অত্যন্ত মনোজ্ঞ ইতিহাস-চর্চার পত্রিকা History Now-এর পুনঃপ্রকাশের প্রয়াসকে পাঠকেরা করতালি দিয়ে তারিফ জানান। পরে ছিল লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের ৭ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

পরদিন ছিল বিভিন্ন গবেষকদের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সরস্বতী নদী কেন্দ্রিক গবেষণাপত্র পাঠ। অনেকেই পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রতিনিধি ও গবেষকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা ও আগ্রহের সৃষ্টি করে। ICHR-এর সক্রিয় সহযোগিতা ও আনুকূল্যে ও তেলেঙ্গানার আয়োজকদের আন্তরিকতায় এই সরস্বতী বন্দনা সর্বার্থেই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

আত্মবিস্মৃতি ও ইতিহাস-বিস্মৃতির জন্যই বাঙালি হিন্দুরা বিপদগ্রস্ত : তথাগত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'বাঙালি হিন্দুরা ৪টি কারণে বিপদগ্রস্ত— সংখ্যার দিক দিয়ে, অত্যাচারে, ধর্মান্তরকরণে এবং আত্মবিস্মৃতির কারণে। নিজের ইতিহাস যারা ভুলে যায় তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দু মিলন মন্দির রচনা করে এবং শ্যামাপ্রসাদের মতো নেতাকে খুঁজে বার করে বাঙালি হিন্দুকে বাঁচিয়ে ছিলেন।' এই ভাষাতেই

বক্তব্য রাখছেন তথাগত রায়। — ছবি : সুমন দে

প্রণব-তর্পণ করলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বালিগঞ্জ আশ্রমে স্বামী প্রণবানন্দ স্মৃতি বক্তৃতা দিতে উঠে তিনি বলেন, বাংলায় মুসলিম জনবিন্যাস দাঁড়িয়ে নেই। দু'পার বাংলা মিলিয়ে হিন্দু মাত্র ৮ কোটি, পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে ছয় আর বাংলাদেশে দেড়; কিন্তু এ রাজ্যে মুসলমান ৩ কোটি আর বাংলাদেশে ১০ কোটি, মোট ১৩ কোটি। কিন্তু স্বাধীনতার সময়েও এই বিন্যাস ছিল যথাক্রমে ৪৭ আর ৫৩ শতাংশ। তবুও ক্ষমার অযোগ্য রাজনৈতিক ভুলের জন্যই বাঙালি হিন্দু আজ অবিশ্বাস্য দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। মাতৃভাষা যাদের বাংলা, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের পদবি দাস, মণ্ডল বা বিশ্বাস নয়, সংখ্যাগুরু পদবি 'মহম্মদ'। এটা হবে আগেই বুঝতে পেরেছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ এবং তাঁরই অবদানে আজ ওপার বাংলায় হিন্দু-সংস্কৃতি টিকে রয়েছে, তার মূল প্রেরণা হলো 'হিন্দু মিলন মন্দির'।

তিনি বলেন, হিন্দুদের জন্মদানের প্রকৃতি মুসলমানের তুলনায় অনেক কম। ব্রিটিশরা ১৯৩৭ সালে স্বায়ত্তশাসন দেবার পর কংগ্রেস বাজে ছুতোয় সরকার গঠন থেকে দূরে ছিল, ফলে ভোটে পিছিয়ে থাকা মুসলিম লিগ ক্ষমতায় চলে এলো। বিগত পাঁচের দশকের গোড়ায় শিয়ালদহ চত্বর নরকের চেহারা নেবার জন্য ভারত ভাগই দায়ী। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর লেখা 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয়' গ্রন্থটির উল্লেখ করেন তিনি। একমাত্র শ্যামা-হক মন্ত্রীসভাই সে সময় অসাম্প্রদায়িক প্রশাসন দিয়েছিল। শিক্ষার অঙ্গন থেকে রাজনীতির অঙ্গনে যে নেতাকে স্বামী প্রণবানন্দ উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন সেই সরকারের অন্যতম মুখ। তথাগতবাবু বলেন, আগামী দিনে দুটি কাজ তিনি করে যেতে চান— পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু-বিতারণের ইতিহাস এবং শ্যামাপ্রসাদের মহত্ত্বের ইতিহাস লেখার কাজ।

শঙ্করাচার্যের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন, এক সময় বৌদ্ধধর্ম থেকে সনাতনে ফিরিয়ে এনে সমগ্র ভারতকে বেঁধেছিলেন শঙ্করাচার্য। যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দও জাতপাত, অস্পৃশ্যতা থেকে হিন্দুদের বের করে মিলনানন্দে শামিল করেছিলেন। হিন্দু সংগঠনে শামিল আর এস এস-কেও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। হিন্দুত্বের ধ্বজা যারা উড়িয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই জীবনকাল স্বল্প; আদি শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী প্রণবানন্দ। স্বামী প্রণবানন্দের মতো মানুষকেও যখন সাম্প্রদায়িক বলা হয় তখন তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। দু' হাজার বছরের সুপ্তির পর আজ হিন্দুরা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার জন্য শঙ্করাচার্য, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহ, স্বামী প্রণবানন্দ এবং শ্যামাপ্রসাদের অবদান যেন আমরা ভুলে না যাই।

নিমতলায় দাহকাজে গোময়জাত জ্বালানি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চলতি কথায় ঘুঁটে। যদিও বাংলার সাবেকি রান্নাঘরে জ্বালানি হিসেবে যে ঘুঁটে ব্যবহৃত হতো তার থেকে আলাদা। বড়োসড়ো, গোলাকৃতি। মুঠোয় একটাই ধরা যায়। জানা গেছে, কলকাতার নিমতলা শ্মশানে অচিরেই এই গোময়জাত ঘুঁটে দাহকাজের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। কাঠ এবং বিদ্যুতের বিকল্প খোঁজার জন্য এই পরিবেশবান্ধব জ্বালানির কথা ভাবা হয়েছে। বারাণসীতে অনেক আগে চালু হলেও কলকাতায় এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। সম্প্রতি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে প্রকল্পটি রূপায়ণে সবুজে সঙ্কেত দেওয়া হয়। কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদের সদস্য অতীন ঘোষ বলেন, 'গোময়জাত এই বিশেষ ধরনের ঘুঁটে প্রকৃতিগত ভাবে পরিবেশবান্ধব। তাছাড়া, গোময় থেকে তৈরি বলেই এই ঘুঁটের সাহায্যে দাহ করাকে অনেকে পবিত্র বলে মনে করেন। আমরা প্রত্যেককে তিনটি বিকল্প দিচ্ছি— কাঠের চিতা, বৈদ্যুতিক চুল্লী এবং ঘুঁটে। যার যেটা পছন্দ সেটা বেছে নেবেন।' এখনও পর্যন্ত ৩৫টি পরিবার পুরসভার এই নতুন পরিষেবা বেছে নিয়েছে। সূত্রের খবর, এই নতুন পদ্ধতিতে শবদাহ করলে তা বৈদ্যুতিক চুল্লী বা কাঠের চিতার থেকে শস্তা হবে। পুরসভা নিমতলার মতো কেওড়াতলাতেও এই পরিষেবা চালু করতে চায়। বর্তমানে দুটি শ্মশানই প্রেরণা ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। প্রেরণার কর্ণধার পবন টিবরেওয়াল বলেন, 'এই ব্যবস্থা একবার শুরু হলে গোনিধন যেমন অনেকাংশে বন্ধ হবে, কর্মসংস্থানও তেমনি বাড়বে।'

ত্রিপুরায় বিজেপির বিজয় রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ত্রিপুরায় সিপিএমের আধিপত্য চূর্ণ করার লক্ষ্যে আয়োজিত বিজয়রথ যাত্রায় সম্প্রতি অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হয়ে গেল। যাত্রার সূচনা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ একটানা ২৫ বছর ক্ষমতায় থেকে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ত্রিপুরাকে শুধুমাত্র দুর্নীতি, অপরাধ এবং বেরোজগারির অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেননি বলে মন্তব্য করেন। বলেন, 'ত্রিপুরার অবস্থা এতই খারাপ যে রাজ্যটিকে খরচ চালাবার জন্য ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ অন্যান্য রাজ্যের উন্নয়নের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। আমি মানিক সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ত্রিপুরাকে উন্নয়নের রাস্তায় ফেরাতে আপনার আর কত বছর সময় লাগবে?' রাজনাথ সিংহ আরও বলেন, 'অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রথম উত্তরপূর্বাঞ্চলের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন। আমরাই প্রথম ত্রিপুরা থেকে দিল্লি পর্যন্ত রাজধানী এক্সপ্রেস চালু করি। আমাদের সময়েই আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস চালু হয়।' ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বলেন, 'বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সাংবাদিক হত্যার তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে।' রাজনাথ সিংহ ছাড়াও বিজয়রথ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিপ্লবকুমার দেব এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

উবাচ

"ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বের ওপর দেশবাসীর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। পাকিস্তানকে তারা যোগ্য জবাব দেবে।"

রাজনাথ সিংহ
ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘন করে পাক সেনার হামলার সম্প্রতি ৪ জওয়ানের শহিদ হওয়া প্রসঙ্গে

"কিষেনজি খুনের নথি ভারতী ঘোষের কাছে রয়েছে। তা যদি উনি প্রকাশ করে দেন বিপদে পড়বেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি

প্রাক্তন পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষকে রাজ্য সরকারের সিআইডি হেনস্থা প্রসঙ্গে

"কোর্টরুমের কথাবার্তাকে মাছের বাজারের স্তরে নামিয়ে আনবেন না।"

ডি. ওয়াই চন্দ্রচূড়
সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি

সি বি আইয়ের জজ বিএইচ লোধার মৃত্যুর শুনানির সময় দুই আইনজীবীর তরজা প্রসঙ্গে

"আপনারা তাজ মহোৎসব বলতে পারেন অথবা তেজমহোৎসব। আমাদের তেজ মন্দিরে আওরঙ্গজেব গোরস্থান তৈরি করেছিলেন। তাজমহলকে দ্রুত তেজ মন্দিরে পরিবর্তিত করা হবে।"

বিনয় কাটিয়ার
বিজেপি সাংসদ

আগ্রায় অনুষ্ঠিতব্য তাজ মহোৎসব প্রসঙ্গে

"আমার আর একটা ছেলে থাকলে তাকেও সেনাবাহিনীতে পাঠাতাম।"

সুনীতা কুণ্ডু
নিহত ক্যাপ্টেন কপিল কুণ্ডুর মা

রাজৌরি সেক্টরে পাক গোলায় একমাত্র ছেলের মৃত্যু প্রসঙ্গে

২০১৯-এর নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে ‘ওয়ান ইজ টু ওয়ান’ ফর্মূলা মমতার

আগামী বছর লোকসভার নির্বাচনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে হারাতে মরিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, সব আসনে ‘একের বিরুদ্ধে এক’ প্রার্থী দিতে। যেখানে যে দল শক্তিশালী তারাই সেখানে প্রার্থী দেবে। বিজেপি বিরোধী দলগুলির পারস্পরিক জোট দরকার। তবেই ২০১৯-এ বিজেপির সরকার কেন্দ্রে থাকবে না। দিদির কথাটা ঠিক বোঝা গেল না। তাত্ত্বিক বিচারে দিদির ‘একের বিরুদ্ধে এক’ প্রার্থী দিতে পারলে নিঃসন্দেহে লড়াইটা জোরদার হয়। বাস্তবে সেটা আকাশ কুসুম স্বপ্নবিলাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। কংগ্রেস বিজেপি বিরোধী। সিপিএম বিজেপি বিরোধী, তৃণমূল বিজেপি বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনে কে কাকে কটি আসন ছাড়বে? মমতার তাত্ত্বিক নীতি মানতে গেলে বিজেপি বিরোধী জোটের প্রার্থী দেওয়ার যোগ্যতা আছে একমাত্র তৃণমূলের। কারণ, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের প্রভাব এই রাজ্যে এখন নেই। উলুবেড়িয়া লোকসভা আসন এবং নোয়াপাড়া বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে সিপিএম তৃতীয় স্থানে এবং কংগ্রেস চতুর্থ স্থানে আছে। অথচ এই নোয়াপাড়া আসনটি কংগ্রেসের হাতে ছিল। নিজেদের জেতা আসনে এবার কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র সাড়ে দশ হাজার ভোট। প্রদত্ত বৈধ ভোটের হিসেবে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ছয় শতাংশ ভোট। ফলে উলুবেড়িয়া এবং নোয়াপাড়া কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে জন সমর্থনের নিরিখে কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। রাজ্যের একটিও সংসদীয় আসনে তারা নিজেদের দলীয় শক্তিতে জেতার ক্ষমতা রাখে না। যদি না তৃণমূল নেত্রী সিপিএম এবং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেন।

মুশকিলটা এখানেই। বামেরা নির্বাচনে ‘একলা চলো’ নীতির আগাম ঘোষণা করে দিয়েছে। তারা মমতার ‘ওয়ান ইজ টু ওয়ান’ নীতি মানছে না। সোনিয়া-রাহুলের কাছে দাবড়ানি খেয়ে বাধ্য হয়ে মমতার আশ্রয়ে

গূঢ় পুরুষের কলম

আসতে হয়তো বাধ্য হবেন অধীর চৌধুরীরা। কিন্তু অন্তর থেকে এমন জোট তাঁরা মেনে নেবেন না। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুগামীরা প্রতিবাদে গোপনে বিজেপি প্রার্থীদেরই ভোট দেবেন। এই ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমবঙ্গে বাম-কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে দ্রুত উঠে আসছে বিজেপি। বাম এবং কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা তৃণমূলকে হারাতে তাই বিজেপিকে সমর্থন করবেন তার আগাম ইঙ্গিত পাওয়া গেছে উলুবেড়িয়া এবং নোয়াপাড়ার উপনির্বাচনে। ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়ায় সিপিএম ভোট পেয়েছিল ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার। আর এবার এখানে সিপিএমের ভোট কমে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার। সেখানে বিজেপি প্রার্থী অনুপম মল্লিক উলুবেড়িয়ায় ভোট পেয়েছেন প্রায় ৩ লক্ষ। প্রদত্ত ভোটের ২৩ শতাংশ। বামেরা পেয়েছে মাত্র ১১ শতাংশ। কংগ্রেসের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রাজ্যের কোথাও নেই। এই কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে মমতা কোথাও পৌঁছবেন না। মমতার নীতি মেনে চললে কিছু আসন এই রাজ্যে কংগ্রেসকে ছাড়তে হবে। সেই আসনগুলিতে বিজেপি জিতবে বলেই মনে হয়।

উলুবেড়িয়া ও নোয়াপাড়ার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাচ্ছে যে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি টক্করটা হবে তৃণমূল বনাম বিজেপির। এতে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। সন্দেহ নেই সাম্প্রতিককালে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যে হারে ভোট শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে দলের সাংগঠনিক শক্তি ততটা নয়। নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধিকাংশ বুথে বিজেপির এজেন্টদের পিটিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে। উলুবেড়িয়া এবং নোয়াপাড়া দুই কেন্দ্রে শান্তি রক্ষার দায়িত্বে ছিল রাজ্য পুলিশ। দলদাস পুলিশ জানে যে তৃণমূলের প্রার্থীদের জেতাতে না পারলে তাদেরও আই পি এস ভারতী ঘোষের মতোই শহিদ হতে হবে। তাই প্রয়াত সুলতান আহমেদের মতো পোড় খাওয়া রাজনীতিক উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে ২০১৪-এর নির্বাচনে যে ভোট পেয়েছিলেন, ২০১৮-এর উপনির্বাচনে তাঁর অরাজনৈতিক স্ত্রী তার দ্বিগুণ ভোট পেয়ে সকলকে চমকে দিয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে পুলিশের লাঠির জোরে এবং যথেচ্ছ রিগিংয়ের ফলে। বাম আমলেও পুলিশের মদতে সিপিএম যথেচ্ছ রিগিং করেছিল। বিরোধী দলের এজেন্টদের পিটিয়ে আধমরা করেছে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির কেস দিয়ে ফাঁসিয়েছে। বামেদের শেখানো পথেই ভোট লুঠ করছে তৃণমূল। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, দলদাস পুলিশ এবং সমাজবিরোধীদের মাঠে নামিয়ে দীর্ঘকাল ভোটে জেতা যায় না। যদি যেত তবে মমতা নয়, বুদ্ধদেববাবুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আজও থাকতেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে অতি পরাক্রান্ত বামেরা আজ রাজ্যে সাইনবোর্ড সর্বস্ব পার্টি হয়েছে। এর কারণ, সিপিএম দলকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অবজ্ঞা করেছে। মানুষের চেয়ে পার্টিকে বড় মনে করেছেন আলিমুদ্দিনের নেতারা। দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেননি তাঁরা। ■

চাপ নেবেন না দিদিভাই, মোদীভাইয়ের বই পড়ুন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
সুপ্রিমো, তৃণমূল কংগ্রেস
দিদিভাই,

জানি চাপে আছেন। রাজ্যে বিরোধী ভোট ক্রমশই এককাট্টা হচ্ছে। বিধানসভায় মাত্র তিনটি আসন থাকলেও বিজেপিই রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল। অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারছেন না পুরনো বন্ধু কংগ্রেস কিংবা শত্রুর শত্রু সিপিএমকে। জানি, চাপ নেবেন না বললেই চাপমুক্ত হওয়া যায় না। তবু পড়ে দেখতে পারেন ‘একজাম ওয়ারিয়র’ বইটি। ক’দিন আগেই সেই বই প্রকাশিত হয়েছে। আমি পড়েছি, তাই আপনাকে সাজেস্ট করছি।

শুধু আপনিই নয়, ভাইপো অভিষেক, দূরের ভাই কুণাল, তাপস, কিংবা কাছের শোভনদেরও পড়তে বলুন। সামনেই পরীক্ষা আসছে একের পর এক। ক্লাস টেস্ট নয়, রীতিমতো বড় পরীক্ষা। তাই মন চাঙ্গা করতে হবে। স্ট্রেস থাকলে বুথ দখলের অঙ্ক করতে পারবে না কেউ। অনুব্রত মণ্ডল একেই অক্সিজেন ঘাটতিতে ভোগেন, তার উপরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপিকে পেটাতে হবে। সেটা কেষ্টদারা করে ফেলবেন আমি জানি, কিন্তু স্ট্রেস মুক্ত হয়ে করাটাই ভাল। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না। ওরা বাড়াবাড়ি করলে আবার স্ট্রেস বাড়বে।

মার্চ থেকে দেশজুড়ে শুরু হবে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা। রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু ১২ মার্চ এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু ২৭ মার্চ। ঠিক তার আগে আগেই দেশের সব বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার টিপস দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর পরীক্ষা মিটলেই আপনি ভোটের ডাক দেবেন। তাই পড়ুয়াদের সঙ্গে আপনারাও একটু স্ট্রেসমুক্ত হয়ে যান।

আপনি তো জানেন যে, পরিশ্রমী হিসেবে সুনাম রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানসিক চাপে ভোগেন না তিনি। এমন কথা অনেকবার বিভিন্ন উপলক্ষে বলেছেন। ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানেও কীভাবে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এবার তিনি একটি বই লিখেছেন যাতে বলেছেন কীভাবে পরীক্ষার সময়ে স্ট্রেসমুক্ত থাকা যায়। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশের সমস্ত পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর লেখা নতুন বইয়ের বিষয়েই তিনি পরীক্ষার্থীদের স্ট্রেসমুক্ত হওয়ার বার্তা দেবেন। নয়াদিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়াম থেকে সাড়ে তিন হাজার পরীক্ষার্থীর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখবেন মোদী। এছাড়াও লক্ষ্য, দেশের ১০ কোটি পরীক্ষার্থী ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে যাতে অংশ নিতে পারে। আগে থেকে রেকর্ড করে রাখা পড়ুয়াদের কিছু প্রশ্নের উত্তরও দেবেন নরেন্দ্র মোদী।

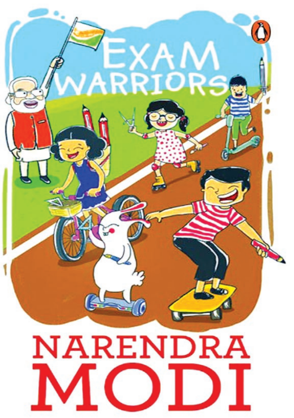

বইয়ে পরীক্ষার চাপ সামলাতে ২৫টি সূত্রের হদিস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বই পড়ে যা দেখলাম, শুধু বোর্ডের পরীক্ষাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াই মাথায় রাখলে জীবনের পরীক্ষাতেও সাফল্য অনিবার্য।

পরীক্ষা ভীতি, ব্যর্থতার আশঙ্কা ও খারাপ ফলের কারণে প্রতি বছর বহু জীবন অকালে ঝরে যায়। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ— কোনও পরীক্ষার ফল সেই সময়ে সেই পড়ুয়ার প্রস্তুতির চিত্রটিকে তুলে ধরে। সার্বিক ভাবে সেই পড়ুয়াকে নয়। সুতরাং একটি পরীক্ষা খারাপ হওয়া মানেই জীবন শেষ হয়ে যাওয়া নয়। তাই বইয়ে পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলো, পর্যাপ্ত ঘুম, এমনকী দেশভ্রমণের উপরে জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আর একেবারে শেষ সূত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ, ছোট থেকেই যোগব্যায়াম ও প্রাণায়াম অভ্যাস করো। নিজের বইয়ে কী কী ব্যায়াম, কীভাবে করা উচিত তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন মোদী।

বইয়ে পড়ুয়াদের বাবা-মা ও শিক্ষকদের উদ্দেশেও খোলা চিঠি লিখেছেন মোদী। বাবা-মায়েরা সন্তানের মাধ্যমে নিজেদের অপূর্ণ ইচ্ছে পূরণের চেষ্টা করে সমস্যা ডেকে আনেন বলে তাঁদের সতর্ক করে দিয়েছেন। উদ্বিগ্ন ছাত্রদের উজ্জীবিত করতে শিক্ষকদের ভূমিকা নিতে অনুরোধ করেছেন মোদী।

আপনি তথা আপনার টিম তো এই রাজ্যের অভিভাবক। তাই আমার মনে হয়, বইটা পড়ুন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জন্য মাস্ট। শিক্ষামন্ত্রী ইদানীং প্রেসার নিতেই পারছেন না। দেখুন না, কাজ হবেই। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।

—সুন্দর মৌলিক

উত্তর সম্পাদকীয়

গণতন্ত্র সংকটগ্রস্ত—এ কথা আর কেউ বলবেন না আশা করি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সদ্য অনুষ্ঠিত দুটি বিধানসভা এবং তিনটি লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয় ঘটেছে। এই পাঁচটি আসনের ভিতর দুটি রাজস্থানের লোকসভা কেন্দ্র— আজমের এবং আলোয়ার। একটি লোকসভা কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের উলুবেড়িয়া। দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের একটি পশ্চিমবঙ্গের এবং একটি রাজস্থানের— যথাক্রমে নোয়াপাড়া এবং মণ্ডলগড়। এই পাঁচটি আসনের ভিতর একটি লোকসভা এবং একটি বিধানসভা আসনে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, দুটি লোকসভা এবং একটি বিধানসভা আসনে জিতেছে কংগ্রেস। রাজস্থানে বিজেপি সরকার থাকা সত্ত্বেও যে তিনটি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে— সেই তিনটি আসনই বিজেপির থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজস্থানের মতো রাজ্যে এইরকম ফলাফল দিয়ে যদিও দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায় না, তবু এই পাঁচটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল এক ঝলক দেখলে মনে হয়— বিজেপির জনপ্রিয়তার পারদ বোধহয় ক্রমশই নিম্নমুখী। এই উপনির্বাচনের পর কংগ্রেস-সহ বিজেপি বিরোধী দলগুলিও এমন একটি ধারণা প্রচার করার চেষ্টা করছে যে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি তার সমর্থন হারাচ্ছে। এবং ২০১৯-এর নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তাদের যে আর বেশি পরিশ্রম করতে হবে না— এই ভেবে বিজেপি বিরোধীরা যথেষ্ট উল্লসিত হয়ে উঠেছে। এ তো গেল পাঁচটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে ওপর ওপর তৈরি করা একটি ধারণা। এই পাঁচটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল বিজেপি তার মতো করে বিশ্লেষণ করবে। কোথায় তাঁদের ঘাটতি রয়ে গিয়েছে তা অনুসন্ধান করে বিজেপি নেতৃত্ব নিশ্চয়ই পরের লোকসভা নির্বাচনের আগে তা মেরামতির চেষ্টা করবেন। সেসব বিষয়ে না গিয়েও একটু গভীরে তলিয়ে ভাবলে কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হবে না— বিজেপির খাতায় সবটাই ক্ষতির হিসেব নয়।

প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকানো যাক। এখানে দুটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছে— উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র এবং নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র। উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সুলতান আহমেদ এবং নোয়াপাড়া কেন্দ্রে কংগ্রেসের মধুসূদন ঘোষের মৃত্যুতে এই আসন দুটিতে উপনির্বাচন হয়। ২০১৪ সালের লোকসভা এবং ২০১৬ সালের বিধানসভা--- এই দুটি নির্বাচনের কোনওটিতেই এই কেন্দ্রে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে বা প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থিত ছিল না। সে জায়গাটি ছিল বাম এবং কংগ্রেসের দখলে। এই দুটি আসনেই বিজেপি রাতারাতি জিতে গিয়ে চমক লাগিয়ে দেবে— এমন আশা বোধকরি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহও কস্মিনকালে করেননি। বিশেষত, যে রাজ্যে সাধারণ নির্বাচনেই প্রশাসনকে অকেজো রেখে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট হয়, রিগিং হয়, নির্বাচনের দিন অবাধ সন্ত্রাস চলে---সেখানে একটি উপনির্বাচনে এসবের মাত্রা যে আরও চড়বে তা সহজেই অনুমেয়। এবং তা চড়েছেও। উলুবেড়িয়া এবং নোয়াপাড়া দু' জায়গাতেই এই উপনির্বাচনে অবাধ ভোট হয়েছে— এমন দাবি করতে বোধকরি শাসক দলের নেতারাও লজ্জিত হবেন। তদুপরি, উলুবেড়িয়া এবং নোয়াপাড়া দুটি কেন্দ্রেই মুসলমান ভোট অনেকটাই নির্ণায়ক শক্তি। লাগামছাড়া তোষণের ফলে এই ভোট প্রায় পুরোটাই চলে আসে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। তাহলে, কিসের আশায় বিজেপি এই দুটি কেন্দ্রে লড়তে নেমেছিল? বিজেপির একটিই লক্ষ্য ছিল— তা হলো, রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক পরিসরটি নিজেদের দখলে আনার। এবং নিজেদের ভোট শতাংশ বাড়িয়ে নেওয়া। যাতে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ও তৎপরবর্তী ২০১৯-এর লোকসভা ও ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে এগিয়ে থাকা যায়। এবং একথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই রাজ্যে সে লক্ষ্যে বিজেপি সফল।

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ছিল ৫,৭০,৭৮৫। সিপিএম পেয়েছিল ৩, ৬৯,৫৬৩ এবং কংগ্রেস ৬৭,৮২৬। বিজেপি পেয়েছিল ১,৩৭,১৩৭। তৃতীয় স্থানে ছিল বিজেপি।এই উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছেন ৭,৬৭,৫৫৬। বিজেপি পেয়েছে ২, ৯৩,০৪৬। সিপিএম এবং কংগ্রেস যথাক্রমে ১,৩৮,৮৯২ ও ২৩,১০৯। বিজেপির ভোট বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১২ শতাংশ এবং তারা দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। ২০১৬ সালে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির ভোট ছিল ২৩,৫০০। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৩৮,৭১১। বৃদ্ধির হার ৮.৩ শতাংশ। এই কেন্দ্রেও দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। মনে রাখতে হবে— এই দুটি কেন্দ্রে ব্যাপক ছাপ্পা এবং রিগিং হওয়া সত্ত্বেও বিজেপির এই ভোট বৃদ্ধি ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই, বিজেপির এই ভোটবৃদ্ধি শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে অনেকটাই শঙ্কিত করবে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী এবং তাঁর পার্ষদরা বারংবার বিজেপিকে এই রাজ্যের রাজনীতিতে অপাংক্তেয় প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এমনকী, বিজেপিকে হেয় করতে সিপিএমের দিকে তারা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে ভোটের গতিপ্রকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে, শাসক দলের হাজারো প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেই এই রাজ্যে ক্রমশ বিজেপির বাড়বৃদ্ধি ঘটছে। বিশেষত কিছুদিন আগেই সবং বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের সময়ই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, এ রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক পরিসরটি আর সিপিএম বা কংগ্রেসের দখলে নেই। ক্রমে বিজেপির দখলেই চলে আসছে। এই দুটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তা আরও ভালোভাবে প্রমাণ

হয়ে গিয়েছে। এই রাজ্যে বিজেপির এই ভোট বৃদ্ধিতে আরও দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে। প্রথমত, শাসক দলের অতিরিক্ত মুসলমান তোষণ নীতির ফলে এই রাজ্যে হিন্দু ভোট যত দিন যাচ্ছে, তত সংগঠিত আকার ধারণ করছে। ২০১৯-এর লোকসভা এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ভোট আরও সংগঠিত হবে। দ্বিতীয়ত, তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী নির্বাচকমণ্ডলী কংগ্রেস-বামদের প্রতি আর আস্থা না রেখে ক্রমশ বিজেপির প্রতিই আস্থাশীল হচ্ছে। এর প্রভাব আসন্ন নির্বাচনগুলিতে কিন্তু অনেকটাই পড়বে। পঞ্চায়েত, লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন যে এই রাজ্যে অনেকটাই বাড়বে— তা এখন আর অলীক কল্পনা থাকছে না। তার চেয়েও যেটা বড় কথা তাহলো— বিরোধী রাজনৈতিক পরিসরটি যদি বিজেপির আরও আয়ত্তে চলে আসে এবং ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপি যদি লক্ষণীয় ভালো ফল করতে পারে, তাহলে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রাজ্যে চমকপ্রদ রাজনৈতিক উত্থান পতন ঘটবে না— তাও হলফ করে বলা যাচ্ছে না। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব খুব ভালো করেই জানেন, ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকে তাদের আসন সংখ্যা কিছুটা কমবেই। সেই ঘাটতি মেটানোর জন্য বিজেপি নেতৃত্বকে তাকাতে হবে উত্তর-পূর্বের এবং ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহারের মতো রাজ্যগুলির দিকে। এখান থেকেই বাড়তি আসন জিতে আসতে হবে তাদের। ইতিমধ্যেই অসম বিজেপির দখলে এসেছে। ত্রিপুরায় নির্বাচন এই মাসেই। সেখানে বিজেপির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। পশ্চিমবঙ্গও ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বকে হতাশ করবে বলে মনে হয় না।

এবার আসা যাক রাজস্থানের প্রসঙ্গে। রাজস্থানের তিনটি কেন্দ্রেই বিজেপির পরাজয় দলের নেতৃত্বকে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তায় রাখবে অবশ্যই। মনে রাখতে হবে, রাজস্থানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই, সেখানকার নির্বাচনে কিছুটা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া বিজেপির বিপক্ষে কাজ করবেই। তেমনই একথাও অস্বীকার করা উচিত হবে না যে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে, বিশেষত কৃষকদের ভিতর কেন্দ্র সরকারের কিছু নীতিকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছিলই। তদুপরি তড়িঘড়ি জিএসটি চালুর ফলেও ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ীরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়েছেনই। এই ক্ষোভ রাজস্থানের সদ্য অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধেই গিয়েছে। সরকারকে এই ক্ষোভের কারণগুলিই অনুধাবন করতে হবে। অবশ্য এবার বাজেটে কৃষি এবং কৃষক স্বার্থের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ২০১৯-এর নির্বাচনের আগে এই সুফলগুলি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তা না পারলে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে লড়াইটা অত সহজ হবে না।

রাজস্থানের উপনির্বাচনে অবশ্য বিজেপির পরাজয়ের আর একটি কারণ কিছু ভুঁইফোঁড় তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের অপরিণামদর্শী কাজকর্ম। ইদানীং এইরকম কিছু কিছু সংগঠন এবং তাদের নেতারা নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেরা হিন্দুত্ব আন্দোলনের মুখ হতে চাইছে। এরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, নরেন্দ্র মোদীর সরকার হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় নয়। সরকারে থাকলে যে কিছু বাধ্যবাধকতার ভিতর দিয়ে চলতে হয়, আবেগে ভেসে কিছু অপরিণামদর্শী কাজ করলে যে সরকারের ভবিষ্যৎটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তা এদের বোঝাবে কে? এরা ভুলে যায় যে, নরেন্দ্র মোদীর সরকারই তাৎক্ষণিক তিন তালাককে নিষিদ্ধ করার মতো সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। হজে ভরতুকি তুলে দিয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে। কাজেই নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ এদের থেকে কিছু কম হিন্দুত্ববাদী একথা মনে করা ভুল হবে। এরকমই একটি সংগঠন এবং তাদের নেতারা নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেরা হিন্দুত্ব আন্দোলনের মুখ হতে চাইছে। এরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, বিজেপি হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় নয়। সরকারে থাকলে যে কিছু বাধ্য বাধকতার ভিতর দিয়ে চলতে হয়, আবেগে ভেসে কিছু অপরিণামদর্শী কাজ করলে যে সরকারের ভবিষ্যতটিই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তা এদের বোঝাবে কে? এরকমই একটি সংগঠন এবার ‘পদ্মাবত’ চলচ্চিত্রটিকে কেন্দ্র করে রাজপুতদের অযথা বিজেপির বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে রাজস্থানে বিজেপির পরাজয়ও ডেকে এনেছে। বিজেপির পরাজয়ে এই সংগঠনের সদস্যরা উল্লাস প্রকাশও করেছে। মনে রাখতে হবে, এভাবেই গুজরাটে বিজেপির বিরুদ্ধে পতিদারদের উসকে দেওয়া হয়েছিল। রাজস্থানেও সেই একই ধাঁচের রাজনীতি হয়েছে। হিন্দুত্বের মুখোশের আড়ালে কারা এই অপরিণামদর্শীদের উসকে দিচ্ছে— তা খুঁজে দেখাও বিজেপি নেতৃত্বের কর্তব্য। আর এই অতি উৎসাহীদেরও মনে রাখা দরকার— বিজেপির পরিবর্তে কংগ্রেস ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করলে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি। সেই ক্ষতিই কি এরা করতে চায়?

এসবের থেকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই উপনির্বাচন প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছে। এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায়। এখানে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে, রিগিং করে, ছাপ্পা ভোট দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে উপনির্বাচনে জিততে হয়েছে। রাজস্থানে বিজেপি ক্ষমতায়। সেখানে কিন্তু রিগিং এবং ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠেনি। সেখানে ভোটে জিততে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারও হয়নি। সেখানে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। এবং সেই নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হয়েছে। এর আগে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের রাজ্য গুজরাটেও কোনও ছাপ্পা এবং রিগিং হয়নি। সরকারি ক্ষমতাকে অপব্যবহার করার কোনও অভিযোগও ওঠেনি এবং সেখানেও নির্বাচনে বিরোধীরা ভালো ফল করেছে। রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা ক্রমাগত অভিযোগ করে থাকেন, নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের আমলে এদেশে নাকি গণতন্ত্র সংকটগ্রস্ত। আশা করি— এসব নির্বাচনের পর তাঁরা এই অভিযোগ বন্ধ করবেন। ভোটে জিতে তাঁরাই তো প্রমাণ করেছেন তাঁদের অভিযোগ কতখানি সারবত্তাহীন। ■

রোহিঙ্গা সমস্যায় চীন, পাকিস্তান সৌদি আরবও দায়ী

মানস ঘোষ

আমার সাম্প্রতিক ঢাকা সফরের সময় বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার সদস্য, সে দেশের কূটনীতিক, বিদেশি কূটনীতিক, ইতিহাসবিদ এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে আমি নিশ্চিত হয়েছি আমাদের এই প্রতিবেশী দেশটি আজ যে মিয়ানমার থেকে আগত ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী সংক্রান্ত সমস্যায় জর্জরিত তা কোনও জাতিগত বিদ্বেষের কারণে নয়। বরং বলা যায় তা চীনের অর্থনৈতিক আগ্রাসী নীতির ফল।

শুধু চীনই নয়। পাকিস্তান, সৌদি আরব এমনকী খোদ মিয়ানমারও, এই চারটি দেশ মিলে তাদের জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সুসমন্বয়ের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ মুসলমান রোহিঙ্গাদের বাসভূমি রাখাইন প্রদেশ থেকে তাদের নির্যাতনের দ্বারা উচ্ছেদ করে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে শরণার্থী হয়ে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু তাদের বাস্তুচ্যুত ও দেশচ্যুত হওয়ার জন্য চীনের ভূমিকা ছিল জঘন্যতম। কিন্তু চীন তার ভূমিকা সুচতুরভাবে বিশ্বের নজর থেকে আড়াল করতে সক্ষম হয়েছে। এটা প্রায় অজানাই রয়ে গেছে যে, বেজিং হচ্ছে মুসলমান রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার মূল কারণ।

বেজিং মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে মার্কিন ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। সেখানকার সিটওয়ে বন্দরকে আধুনিকীকরণ করে একটি টার্মিনাল তৈরি করে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া দক্ষিণ চীনের ইউনান প্রদেশে তার সার্বিক উন্নয়নের জন্য চীনা নীতি নির্ধারকরা চান না ভবিষ্যতে তাদের সম্পত্তি কোনও ধরনের হুমকির সম্মুখীন হোক। রাখাইন প্রদেশে চীনারা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন তৈরি করবে। উদ্দেশ্য হলো রাখাইন প্রদেশে যে অব্যবহৃত বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার আছে (তেল, গ্যাস, টিন, কাঠ ও দামি পাথর রত্ন), তা নামমাত্র মূল্যে কিনে ব্যবহার করে

ইউনানের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো। রাখাইন প্রদেশের মুসলমান রোহিঙ্গারা পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ইসলামি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীদের দ্বারা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যে হারে জড়িয়ে পড়ছে তাতে চীনারা খুবই সন্ত্রস্ত। তাদের ভয় যেসব মুসলমান রোহিঙ্গা স্বাধীন রাখাইন দেশের জন্য মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তারা যদি একদিন চীনা প্রকল্পের ওপর হামলা হেনে সেগুলো ধ্বংস করে তাহলে তাদের বিশাল বিনিয়োগ সম্পূর্ণ জলে যাবে। আর তাদের সাধের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্প, যাকে ভিত্তি করে তারা দক্ষিণ চীনকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তা মুখ থুবড়ে পড়বে। সেই জন্য চীন রাখাইনকে মুসলমান রোহিঙ্গামুক্ত করতে চায়। রাখাইনে মুসলমান রোহিঙ্গারা থাকুক তা চীন কোনওমতেই চায় না। বালুচিস্তানে চীনের অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ। সেখানে বেজিং চীন-পাকিস্তান ইসলামিক করিডোর (সিপিইসি) তৈরি করতে গিয়ে প্রায় ২০ জন চীনা নাগরিককে হারিয়েছে। বালুচিস্তানে গেরিলাদের দ্বারা অপহৃত হবার পর তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। চীনারা চায় না বালুচিস্তানের মতো রাখাইনেও তাদের উন্নয়নের প্রকল্পগুলি থমকে দাঁড়াক। চীন চায় রাখাইনে তাদের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড'-এর প্রকল্পগুলি খুব তাড়াতাড়ি চালু হোক। আর তার সুফল ইউনান প্রদেশ খুব তাড়াতাড়ি ভোগ করতে শুরু করুক। চীনের আরও একটি স্বার্থ হলো রাখাইনে ভারতের কালাদান উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এতটাই পিছিয়ে আছে যে বেজিং চাইছে তার প্রকল্পগুলি তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন করে দিল্লিকে টেক্কা দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে মিয়ানমারে তারা ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

আগেই বলেছি রাখাইন থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়নে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের ভূমিকা নগণ্য নয়। সৌদিদের স্বার্থ হলো মুসলমান রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রান্তিক মুসলমান জনগোষ্ঠীকে কট্টর ওয়াহাবিবাদে দীক্ষিত করা। সেটা মিয়ানমারে বসে সৌদিদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সেই জন্য পুরো রোহিঙ্গা গোষ্ঠীকে যদি বাংলাদেশে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের কাজটা অনেক সহজ হয়।

পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ও রাজনৈতিক। সেই দেশ ভাগের সময় থেকে পাকিস্তানের নেতারা রোহিঙ্গাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। দেশভাগের সময় রোহিঙ্গারা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের অংশই হতে চায়নি, 'হিন্দুস্থানের' কীভাবে ক্ষতিসাধন করা যায় সেই চিন্তা ভাবনার জোগানও পাকিস্তানি নেতাদের সব সময় দিয়ে এসেছে। তাদের এই আনুগত্যের স্বীকৃতি হিসেবে পাকিস্তান তদানীন্তন রাজধানী করাচিতে একটি সুবিশাল রোহিঙ্গা কলোনি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের মদতে Rohingya Solidarity Organization (RSO) নামক একটি সংগঠন গড়ে ওঠে যা রাখাইন প্রদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার জন্য মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বর্তমানে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে আরএসও এবং Arakan Salvation Army। মনে রাখা দরকার যে, রোহিঙ্গারা বর্তমানে পাকিস্তানের আই এস আই-এর দ্বারা পরিচালিত ও তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। পাকিস্তান সবসময় তাদের সবরকমের মদত দিয়ে এসেছে যাতে মুসলমান অধ্যুষিত রাখাইন প্রদেশ একদিন স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রোহিঙ্গাদের সম্বন্ধে সব পাকিস্তান সরকার অতি সচেতনতার সঙ্গে এই

নীতি গ্রহণ করে আসছে যাতে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ওপর এমন এক প্রত্যাঘাত হানে যাতে রোহিঙ্গারা বাস্তুচ্যুত হয়ে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য সব সময় ছিল এবং এখনও আছে যেমন করে হোক যদি ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা জঙ্গি স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে এনে ফেলা যায় তাহলে সেদেশে পাকিস্তানি লবি আরও শক্তপোক্ত হবে। যার ফলে পাকিস্তানের বাংলাদেশের ঘোলা জলে মাছ ধরা সহজ হবে।

পাকিস্তানের এই প্রত্যাশা ছিল যেহেতু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার কারণে তাদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন এবং তাদের সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেন, সেই কারণে তিনি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দেবেন। এবং শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফিরে যেতে বাধ্য করবেন ও তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন। পাকিস্তানের এই ধারণাও ছিল শেখ হাসিনার রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার বিরোধিতার আরও একটি অন্যতম কারণ তিনি যখন একাধিক মুসলমান জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে রত তখন কি তিনি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে খাল কেটে কুমির ডেকে আনবেন? পাকিস্তান এও আশা করেছিল রোহিঙ্গাদের সম্বন্ধে শেখ হাসিনার নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমান প্রধান বাংলাদেশের জনমানসে এক চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ফের রাজনৈতিক ফায়দা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় ইসলামিক জোট আগামী সংসদীয় নির্বাচনে তুলবে।

পাকিস্তান ও বেগম জিয়ার জোট রোহিঙ্গা ইস্যুকে ব্যবহার করে যাতে লাভবান না হয় সেই কথাটি মাথায় রেখে শেখ হাসিনা শরণার্থীদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শরণার্থীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে তিনি রাতারাতি 'মাদার অব হিউম্যানিটি' অভিধায় ভূষিত হন। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করে ইস্যুটিকে internationalize করেন। ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তাদের দোসর জামাত রোহিঙ্গা ইস্যুকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করে শেখ হাসিনাকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে চরম বেকায়দায় ফেলার যে ছক কষেছিল তা ভেস্তে যায়।

আসলে পাকিস্তানের মূল রাজনৈতিক খেলা হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের হাতিয়ার করে শেখ হাসিনার সরকারকে নির্বাচনের আগে টালমাটাল অবস্থায় নিয়ে গিয়ে তার পতন ঘটানো। চীন, পাকিস্তান ও সৌদি আরব রোহিঙ্গাদের রাখাইন থেকে উৎখাতে মদত দিচ্ছে, ভবিষ্যতে তাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনও লক্ষ্য নেই। তাদের সকলের উদ্দেশ্য হলো রোহিঙ্গাদের স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে পুনর্বাসন করিয়ে হাসিনা সরকারের পতন ঘটানো এবং পরবর্তীতে ভারতে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সেখানে তাদের দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো যাতে ভারতও চরম অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে যারা সন্ত্রাসী তাদের নিয়ে শেখ হাসিনার সরকার খুবই চিন্তিত। যে কারণে শরণার্থী শিবিরের চারদিক কাঁটাতার ও মিলিটারি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, যাতে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে না পারে। তা সত্ত্বেও রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। শেখ হাসিনা জানেন রোহিঙ্গা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে বাংলাদেশ এক চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। যার ফলস্বরূপ দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

শেখ হাসিনার মাথাব্যথার আরও একটি কারণ হলো, যেভাবে খালেদা জিয়া ও জামাতের নেতৃত্বে ইসলামি দলগুলো এবং সৌদি সমর্থিত বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও-রা স্বাধীন রাখাইন রাষ্ট্রের জন্য সহিংস সংগ্রামের জন্য উস্কানি দিচ্ছে তাতে ঢাকা-নেপিদ সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই সব দল ও সংগঠন বাংলাদেশ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যাতে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার জন্য ইন্ধন জোগাতেও পিছপা নয়। ১৯৯২-তে নির্যাতনের কারণে যখন প্রায় ছয় লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে তখন তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য খালেদা সরকার ইয়াঙ্গনের সঙ্গে যে চুক্তি করে তা এতটাই বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ছিল যে প্রায় চার লক্ষ শরণার্থী নিজের দেশে ফিরে যেতে পারেনি। কারণ সেই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল মিয়ানমার শুধু সেই সব শরণার্থীদের ফেরত নেবে যাদের কাছে মিয়ানমারের বৈধ নাগরিকত্ব বা বাস্তুভিটের দলিলপত্র আছে। বাংলাদেশের অনেক কূটনীতিক বলেন বেগম জিয়া ইচ্ছে করেই এই অন্যায় শর্তে রাজি হয়েছিলেন। কারণ তিনি ও জামাতিরা মনে প্রাণে চেয়েছিলেন রোহিঙ্গারা যেন তাদের দেশে ফিরে না যায়। যাতে তারা তাদের ভোটব্যাঙ্ক হয়ে ওঠে।

দুর্ভাগ্যবশত ১৯৯২ চুক্তির ওই শর্তগুলো গত ২৩ নভেম্বর ঢাকা-নেপিদ'র মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রত্যার্পণ চুক্তিতে স্থান পেয়েছে। তার মানে যে ১০ লক্ষ শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে তাদের এক বিরাট অংশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারবে না কারণ তাদের অনেকের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র নেই।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হলো বাংলাদেশে তাদের জীবিকার কোনও সুযোগ নেই। ফলে তারা নানান জঙ্গি সংগঠনে নাম লিখিয়ে তাদের ভাড়াটে সৈনিক হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ করছে। তাদের অনেকে ইতিমধ্যে সিরিয়া ও ইরাকে যুদ্ধ করে আরাকানে ফিরে Arakan Salvation Army-তে যোগ দিয়েছে। তাদের অনেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্যে রোহিঙ্গা যুবকদের অস্ত্র চালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

এরা শুধু শেখ হাসিনা নয়, ভারতেরও ভয়ের কারণ। ইতিমধ্যে পাকিস্তান ও সৌদিদের পরিকল্পনামাফিক রোহিঙ্গা শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের লক্ষ্য হলো পাকিস্তান ও জামাতের ভাড়াটে সৈনিক হয়ে ভারতের নানা স্থানে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে ভারতকে দুর্বল করা। ফলে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভারতকেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। নাহলে এই সমস্যা দুষ্টক্ষতের মতো ভারতকেও ভোগাবে। ▮

কনভেনশনে উদ্বেগ প্রকাশ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা অস্তিত্বের সংকটে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ঢাকায় জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশনের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, যে চেতনার ওপর ভিত্তি করে ১৯৭১ সালে ধর্মনির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালি-জনজাতি জনগণের মিলিত রক্তস্রোতে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল, স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ৪৭ বছর পরও বাংলাদেশ তা থেকে যোজন দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ আজ সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সাম্য, সমতা ও সামাজিক মর্যাদার যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল তা এখনও সোনার পাথরবাটি। এই সর্বনাশা পরিস্থিতিতে দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতি জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। কনভেনশনে আলোচকরা বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘু ও উপজাতি শঙ্কিত। অতীতের সংসদ নির্বাচনগুলোর আগে ও পরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলার অভিজ্ঞতা তাদের আছে। নির্বাচন তাদের কাছে উৎসব নয়, অভিশাপ ও আতঙ্কের।

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশনের আয়োজন করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বাধীন ১৯টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতি সংগঠন। সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তারা যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের তিন সভাপতির অন্যতম হিউবার্ট গোমেজ। বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের আরেক সভাপতি, পার্বত্য জনসংহতি পরিষদের নেতা ও সাংসদ ঊষাতন তালুকদার, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি ও ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আওয়ামি লিগ দলীয় সাংসদ ছবি বিশ্বাস, মনোরঞ্জন শীল গোপাল, সাধন মজুমদার ও পঙ্কজ দেবনাথ, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপি নেতা গৌতম চক্রবর্তী, বিএনপির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা বিজন কান্তি দাস, বিএনপির-সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুণ্ডু, জাতীয় পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুনীল শুভ রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক ও অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়া, বিশিষ্ট অভিনেতা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, লে. কর্নেল (অব.) নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, ক্যাপ্টেন (অব.) শচীন কর্মকার, পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, সাবেক সচিব হীরালাল বালা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

স্বাগত বক্তব্যে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত রানা বলেন, দেশে বিরাজিত রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও উপজাতি জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, পদোন্নতিতে বিগত বছরগুলোতে বেশ খানিকটা ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটলেও পূর্বেকার মতো একটানা সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন, ভয়-ভীতি-হুমকি, জমি জবরদখল, এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে হত্যা তাদেরকে দিশেহারা ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। দেশত্যাগের প্রবণতা আবার দেখা দিয়েছে, অনেকে ইতিমধ্যে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারাকাতের গবেষণাগ্রন্থ 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি'তে বলা হয়েছে, ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিগত পাঁচ দশকে আনুমানিক ১ কোটি ১৩ লক্ষ লোক নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ গড়ে বছরে দেশান্তরিত হয়েছেন আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ জন। এই অর্থনীতিবিদ মনে করেন, এই নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার প্রবণতা বজায় থাকলে এখন থেকে দু'তিন দশক পরে এদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর কোনও মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, রাজনীতি এখন আর রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ বলেছেন, 'জাতীয় সংসদ সদস্যদের শতকরা ৮৪ ভাগই ব্যবসায়ী।' রাজনীতি আজ ভূমিদস্যু, ব্যাঙ্ক ডাকাত ও দুর্নীতিবাজদের হাতে। কাজেই দেশ স্বাভাবিকভাবে চলছে না, এ সত্যি অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশে আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আক্রান্ত, তাই সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত, জনজাতিরা আক্রান্ত। রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধীদের খপ্পরে পড়েছে। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এই কনভেনশন থেকে রাজনীতিবিদের কাছে নিশ্চয়ই এই বার্তা পৌঁছুবে যে, সংখ্যালঘুরা ভালো নেই। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা আজ অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আসা রাজনৈতিক বক্তব্য আর মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। এটা সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হয়তো ধারণা

করতে পারছেন না। গণতন্ত্রের মধ্যেই সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থ নিহিত। তাই গণতান্ত্রিক ধারা শক্তিশালী করা ছাড়া বিকল্প নেই। আওয়ামি লিগ সাংসদ মনোরঞ্জন শীল গোপাল বলেন, সংখ্যালঘুরা সবসময় আওয়ামি লিগের সঙ্গে ছিল, ভোট দিয়েছে। আওয়ামি লিগকেও সংখ্যালঘুদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির নামে যারা সংখ্যালঘুদের জমি দখল করে, নির্যাতন-হামলা চালায়, তারা জামাতের চাইতেও খারাপ। সাংসদ পঙ্কজ দেবনাথ বলেন, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠনগুলো সমর্থন করেছে। এই ৭ দফার মধ্যে আছে, বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য বিলোপ, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। আর গত ৯ এপ্রিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা-সহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনরূপ প্রচার নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীপদ বাতিল-সহ অন্যূন এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমাজে শক্ত ভিত গড়ে তুলেছে। ভোটের রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঘোষণাপত্রে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, হামলা, জমি জবরদখলের সঙ্গে যুক্ত কাউকে মনোনয়ন না দেওয়ার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, এমন কাউকে মনোনয়ন দিলে সংখ্যালঘুরা ভোটদানে বিরত থাকবে।

কনভেনশনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য, অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৭ দফা এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রণীত ৫ দফা দাবি সমর্থন করেছেন। বর্ষীয়াণ জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে বলেছেন, এই কনভেনশনের মধ্য দিয়ে একটা শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত মহাসমাবেশে জাতীয় ঐকমত্যের ৭ দফা দাবি গৃহীত হয়েছিল যা ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও উপজাতি ঐক্য পরিষদের জাতীয় কাউন্সিলে আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৫ দফা গৃহীত হয় যা অন্য ১৮টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতি সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি গ্রহণ করেছে। এই ৫ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল বা জোট আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবে না, যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কোনও প্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সেসব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে। যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে ৭ দফা সমর্থন এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন, জনজাতিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ-সহ জনসংখ্যার বিধান প্রণয়ন এবং নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সমতলের উপজাতিদের জন্যে ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন বাস্তবায়ন-সহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা। এই ৭ দফা ও ৫ দফা কনভেনশনে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এর অর্থ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও উপজাতিরা রাজনীতির গণ্ডি পেরিয়ে নিজেদের স্বার্থে আরও কাছাকাছি এসেছে। যে ১৯ সংগঠন নিয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটি সেটিও সম্প্রসারিত করার জন্যে অনুরোধ করেছেন অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বিএনপির সংখ্যালঘু নেতারা তো স্পষ্টভাবেই কথাটা উচ্চারণ করেছেন, তারা সমন্বয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত হতে চান। অর্থাৎ অধিকার ও বঞ্চনার বিষয়টি আজ মুখ্য হয়ে উঠেছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে কনভেনশনে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

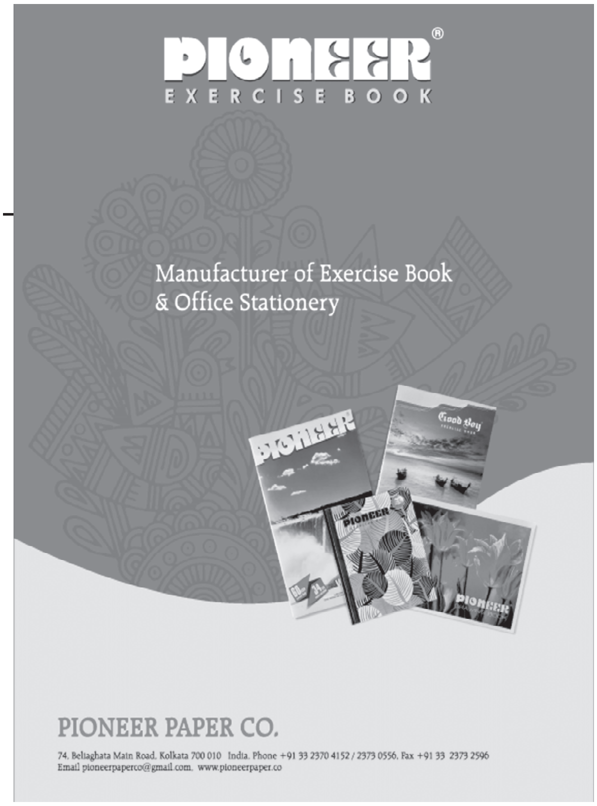

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

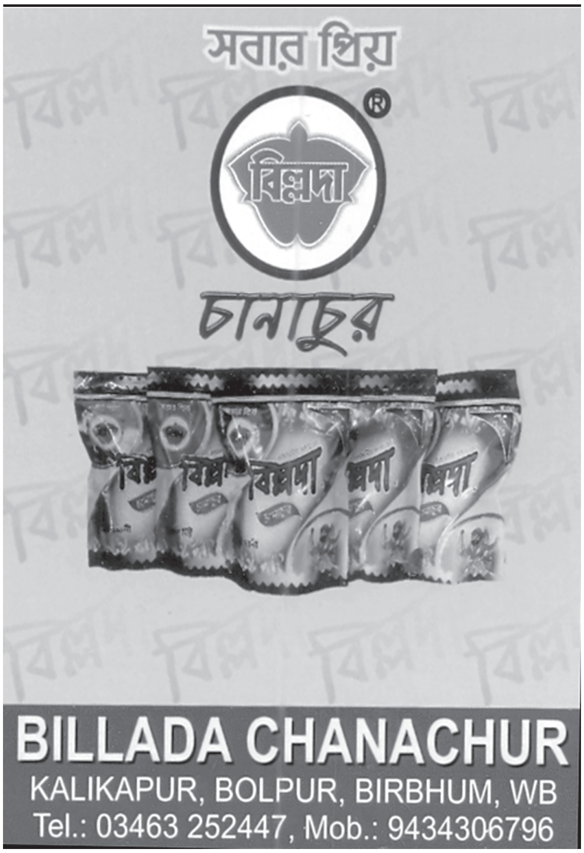

ত্রিপুরা ভাঙার অভিযোগ সিপিএমের ভাঁওতা

গৌতম দত্ত

নির্বাচন ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি হবে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন। তাই ত্রিপুরা জয়ের জন্য বিজেপি ও ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব তুইপ্রার (আইপিএফটি) মধ্যে জোট হয়েছে। ২৫ জানুয়ারি আগরতলায় টাউন হলে বিজেপি দলের প্রাক নির্বাচনী বৈঠকে বিজেপি আইপিএফটি জোট গঠনের কথা জানান, অসমের অর্থমন্ত্রী তথা ত্রিপুরায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী তত্ত্বাবধায়ক ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

এই জোট গঠন নিয়ে সিপিএমের অপপ্রচারের জবাবে তাঁর বক্তব্য— সিপিএম যতই সমালোচনা করুক না কেন, ত্রিপুরাকে কিছুতেই ভাঙতে দেওয়া হবে না। এই শর্তেই বিজেপি আইপিএফটির সঙ্গে নির্বাচনী জোটে যেতে রাজি হয়েছে। সিপিএমের শাসনের আমলে এত মহিলা বলাৎকার হয়েছে, বিএসএফ খুন হয়েছে, সাংবাদিক খুন হয়েছে, কিন্তু কাউকে শাস্তি দিতে পারেনি। দু’ দলের নির্বাচনী সমঝোতায় ত্রিপুরা বিভাজনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। এটা সিপিএমের অপপ্রচার মাত্র। বিজেপি আইপিএফটি যুগ্মভাবে লড়াই করবে। আসন্ন নির্বাচনে বামফ্রন্টকে হঠানোর জন্য আর অপশাসন থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করার জন্যই এই জোট। তাই এবারে নির্বাচনে শাসকদলের কাছে বিজেপি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ত্রিপুরাকে ভাগ না করে একত্রে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিজেপি বলছে— এক ত্রিপুরা, শেষ ত্রিপুরা, এক ভারত।

আইপিএফটিকে উপজাতি সংরক্ষিত কুড়িটি আসনের মধ্যে নয়টি আসন বিজেপি ছেড়ে দিয়েছে। যে নয়টি আসন আইপিএফটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলি হলো— সিমলা, টাকারজলা, অম্পিনগর, মনুবাজার, রাইমাভ্যালি, রামচন্দ্রঘাট, আশারামবাড়ি, কাঞ্চনপুর এবং করবুক। এই নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জোটসঙ্গী আইপিএফটি আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। অপরদিকে, ৬০ সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভা আসনের মধ্যে আইপিএফটিকে নয়টি আসন ছেড়ে দিয়ে বিজেপি বাদবাকী একান্নটি আসনে লড়বে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি বিপ্লব দেব ও ত্রিপুরায় নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুনীল দেওধরও এ বিষয়ে একমত।

বিজেপি আইপিএফটি মিলে জনজাতি সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করবে। ভারত সরকার এই লক্ষ্যে একটি কমিটি বানাবে। সিপিএম এই সমঝোতা ভাঙার জন্য অনেক চেষ্টায় ছিল, কিন্তু সফল হয়নি। প্রসঙ্গত, আইপিএফটির মূল দাবি ছিল পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ড। কিন্তু তাদের এই দাবি কেন্দ্র-রাজ্য কেউ মেনে নেয়নি। শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবি ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে আইপিএফটি নির্বাচনী আঁতাতে যেতে হয়েছে। তাই ত্রিপুরা ভাঙার অভিযোগ ভিত্তিহীন— অপপ্রচার মাত্র।

আরও একটা বিষয় ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যা ত্রিপুরার নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। ত্রিপুরার তরুণ মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এআইসিসি-কে স্মরণ করিতে দিয়েছেন, ত্রিপুরার ভাবাবেগ তাদের মাথায় রাখতে হবে। সিপিএমের আক্রমণে কংগ্রেস কর্মীরা নির্যাতিত হয়েছে এবং উপজাতি সংস্কৃতিকে বাম সরকার কীভাবে ধ্বংস করেছে। এই পোস্টের আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও সুনীল দেওধর। ফলে প্রদ্যোৎ মাণিক্যের বিজেপি-তে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে।

কমিউনিস্ট শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে জাতীয়তার জয়গান গাইবে ত্রিপুরা

ইন্দ্র গুপ্ত

২৫ বছরের একটি জগদ্দল পাথর। কান পাততে হবে না। দূর থেকেই শুনতে পাওয়া যাবে সেই পাথর থেকে বেরিয়ে আসছে খুন হয়ে যাওয়া কয়েক হাজার মানুষের আর্তনাদ, বিধবা নারীর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ, পুত্রহারা মা-বাবার অসহায় আর্তি, ধর্ষিতার গোঙানি, শোষণ-বঞ্চনায় পিষ্ট হয়ে যাওয়া যৌবনের দীর্ঘশ্বাস। দেখতে পাওয়া যাবে সেই পাথর বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে তলপেটে কমরেডের লাথি খেয়ে গর্ভপাত ঘটে যাওয়া নারীর জঠরের রক্ত-রস। দেখতে পাওয়া যাবে 'ভারতমাতা কী জয়' বলার অপরাধে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রকে জোর করে মূত্রপান করানোর ছবি পাথরের ঢালে আঁকা হয়েছে।

বন্ধু, আপনাকে দেশের প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরায় স্বাগত। এখানে শাসক কমিউনিস্ট পার্টি। তাদের চেহারা ভারতীয়। ভাষা ভারতীয়। খাদ্য ভারতীয়। কিন্তু হৃদয় চাইনিজ। তারা চাইনিজ। তারা চাইনিজ টয় বা পুতুল। তাদের কর্মকাণ্ড জাতীয় কল্যাণের ভাবনায় পরিচালিত না হয়ে আন্তর্জাতিক ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে দেশকে নানাভাবে অপদস্থ করে দেশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করার মধ্যেই বামাচারীদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালিত। ভারতকে টুকরো টুকরো করবার স্লোগানদাতাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে তারা নিজেদের ভারত-বিরোধী অবস্থানকে স্পষ্ট করেন। এরকম অপশক্তি যখন একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করে, তখন সেই রাজ্যের সাধারণ মানুষ কী ধরনের দুঃখ-যন্ত্রণা-নির্যাতনের শিকার হন তা অনুমান করা সহজ নয়। জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিগত আড়াই দশকে ত্রিপুরায় কয়েক হাজার মানুষ খুন হয়ে গেছেন। যেখানেই বিরোধী কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায় সেখানেই এই ফ্যাসিবাদী শক্তি মানুষের কণ্ঠরোধ করতে খুন করার খেলায় মেতে ওঠে। নৃশংসতা ও পশুত্বের উপর গড়ে উঠেছে এই বাম রাজত্ব। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সুচতুরভাবে সখ্য বাড়িয়ে এই ঘাঁটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে। রাজ্যের প্রতি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপেক্ষা ফ্যাসিবাদী কমিউনিস্টদের আরও নৃশংস হতে উৎসাহিত করেছে।

কমিউনিস্টদের প্রতি কংগ্রেসের এই দুর্বলতার কারণ স্পষ্ট। সংখ্যার খেলা। রাজ্যে ক্ষমতা পুনর্দখলের চেয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বামপন্থীদের সমর্থনে কেন্দ্রে ক্ষমতায় টিকে থাকা। সেই কারণেই কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বামপন্থীদের সঙ্গে সব সময় সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিল। যার ফলে ত্রিপুরায় বামাচারীদের হাতে গণতন্ত্র বারবার পদদলিত হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে এবং নৃশংসতা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে শ্বাস ফেলেছে। বাম-বিরোধী মনোভাবাপন্ন মানুষকে হত্যার পাশাপাশি তাদেরকে অর্থনৈতিক অবরোধের দিকে ঠেলে দিয়ে ভাতে মারার কৌশল নেওয়া হয়েছে। বছরের পর বছর অত্যাচারিত এই মানুষগুলো এখন মানুষ হিসেবে তাদের যে ন্যায্য পাওনা আছে সেগুলিও ভুলে গেছে বা মুখ ফুটে চাওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। রাজ্যের ৬৭ শতাংশ জনগণকে

দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করতে বাধ্য করে রাজ্যের মুখিয়া মানিকবাবু যে লুঠের রাজত্ব কায়েম করেছেন তা আগাগোড়া কমিউনিস্ট শৃঙ্খলায় মোড়া। সরকারি চাকরি, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অর্থ এমনকী খাদ্য-সুরক্ষা প্রকল্পের চালও নীরবে গিলে ফেলছেন মানিকবাবু ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। বেছে বেছে শুধু সিপিএম দলের সভ্য-সমর্থকদেরই সরকারি চাকুরি থেকে শুরু করে অন্য সকল সুযোগ সুবিধা মিলেছে। কমরেডদের অট্টালিকার পাশেই গরিবের হতদরিদ্র ঝুপড়ি মানিকবাবুর আদর্শ শাসনের ফল। মা-বোনেদের যৌনদাসীতে পরিণত হওয়া মানিকবাবুরই দান। আট লক্ষ বেকার মানিকবাবুর সুশাসনের অঙ্গ। কর্মহীনতার কারণে যুবশক্তির নেশার কবলে ঢলে পড়া মানিকবাবুর আরেকটি কৃতিত্ব। এরকম বীভৎস ও শোষণ-সমৃদ্ধ যুগকে কমরেডরা বলছেন 'স্বর্ণযুগ'। আসলে এ হলো ধর্ষণের স্বর্ণযুগ। নেশার স্বর্ণযুগ। কর্মহীনতার স্বর্ণযুগ। খুনের স্বর্ণযুগ। অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার যতই তীব্র হোক না কেন তা এই প্রান্তিক রাজ্যের বাসিন্দাদের দেশভক্তিকে নষ্ট করে দিতে পারেনি। তাঁরা গরিব থেকে গরিবতর হয়েছেন, তাঁদের ঘরের মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে, বাবা পুত্রহারা হয়েছেন কিন্তু কোনও কিছুই দেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকে নষ্ট করতে পারেনি। তা প্রমাণিত হয় সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরায় জাতীয়তাবাদের জাগরণের মধ্য দিয়ে। কমিউনিস্ট রক্তচক্ষুকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সংগঠিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী শক্তি। এক প্রবল প্রতিস্পর্ধী-শক্তি জেগে উঠেছে ত্রিপুরার বুকে, যে শক্তির উৎস রাষ্ট্রপ্রেম। 'ভারতমাতা কী জয়' স্লোগান এখন ভয়ে ভয়ে উচ্চারিত হয় না। লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হয়ে যখন মাতৃ-বন্দনায় স্লোগান দিতে দিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে— তখন প্রমাণিত হয় এই প্রান্তিক রাজ্যের মানুষের মধ্যেও রাষ্ট্রপ্রেম কতটা জাগ্রত। অত্যাচারিত মানুষগুলি নতুনভাবে বাঁচাতে চায়। মাথা তুলে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে চায়। হীনমন্যতার অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে আলোয় ফিরতে চায়। কমিউনিস্ট শৃঙ্খলকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এতো বছর তাদেরকে পরিচালিত করবার মতো কোনও শক্তি ত্রিপুরায় ছিল না। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদের ঝিমানো ভাব কাটিয়ে দিয়ে এই মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের সংগঠিত করেছে। খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সঙ্ঘের জনপ্রিয়তা। যুবকদের মধ্যে সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ নেওয়ার চাহিদা বেড়ে গেছে। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের সভায় হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি জাতীয়তাবাদের জাগরণের প্রমাণ। এই মানুষগুলিকে রাজনীতি সচেতন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিও। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের আচরণে স্পষ্ট হয়ে গেছে তারা ত্রিপুরার অবরুদ্ধ মানুষকে মুক্তি দিতে চান। জাতীয় দল হিসেবে এটা করা বিজেপির কর্তব্যও। যারা রাজ্যের মঙ্গল চায় না, রাজ্যের মানুষকে দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পিষে মারতে চায়, যারা শুধু মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিতেই জানে— সেই রাষ্ট্র বিরোধী শক্তির চোখে চোখ রেখে লড়াইয়ে নেমেছে দেশপ্রেমে ভরপুর নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের ঐক্য। এবার মনে হয় ত্রিপুরার মানুষ মুক্তির জয়গান গাইবে--- জাতীয়তাবাদের জয়গান গাইবে। ■

ত্রিপুরার জনসংখ্যা ৩৬.৭৪ লক্ষ
এর এক তৃতীয়াংশ তপশিলি জনজাতি
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনঘনত্ব ৩৫০ জন

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য :

● ১৯৭৮ সাল থেকে ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের শাসন চলছে। মাঝখানে ১৯৮৮-১৯৯৩ এই পাঁচ বছর শাসনক্ষমতায় কংগ্রেস জোট। ত্রিপুরার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯৯৮ সালে।

● প্রাথমিক ভাবে সন্ত্রাস রোধ করতে সফল হলেও বাম আমলের শেষ পর্যায়ে ত্রিপুরায় আবার পৃথক ত্রিপরাল্যান্ডের জিগির ওঠে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় আই পি এফ টি। আশ্চর্যজনক ভাবে বাম সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সহমত হয়ে পৃথক রাজ্যের জন্য সওয়াল করে। কারণ ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই জনজাতি।

● ২০১৭ সাল থেকে ত্রিপুরায় বাম দলগুলির জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে শুরু করে। এবছর কয়েকটি উপনির্বাচনে বিজেপি রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করে। পুরসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনেও পঞ্চাশের বেশি আসন দখল করে নেয়।

● এবারের নির্বাচনে বিজেপি আই পি এফ টি-র সঙ্গে জোট বেঁধেছে। ত্রিপুরা ভাঙার পরিকল্পনা থেকে সরে আসার প্রতিশ্রুতি দেবার পরই বিজেপির পক্ষ থেকে আইপিএফটি-র সঙ্গে জোট গঠনের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। ৬০টি আসনের মধ্যে বিজেপি লড়বে ৫১টি আসনে। বাকি আসনগুলিতে লড়বে আইপিটিএফ।

● গতবারের নির্বাচনে (২০১৩) সিপিএম পেয়েছিল ৪৯টি আসন। কংগ্রেস ১০টি। কিন্তু ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-সিপিএমের জোট হওয়ার পর ত্রিপুরায় কংগ্রেসের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ৬ জন বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে সবাই চলে আসেন বিজেপিতে। কংগ্রেস থেকে আসেন আরও একজন।

ত্রিপুরায় বিজেপির বিদায়ী বিধায়কদের নাম :

১। সুদীপ রায় বর্মন--- আগরতলা, রতনলাল নাথ--- মোহনপুর, আশিস কুমার সাহা— টাউন বরদলৈ, দিলীপ সরকার— বাদারঘাট (তপশিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত), প্রাণজিৎ সিংহরায়— রাধাকিশোরপুর, দিবাচন্দ্র হ্রাংখোয়াল— করমচারা (তপশিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত), বিশ্ববন্ধু সেন— ধর্মনগর।

দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যই উত্তর-পূর্ব ভারতে সাফল্য দরকার বিজেপির

বাঙালি ও ত্রিপুরী জনজাতির মধ্যে বিভেদের বিষবাষ্প সৃষ্টি না করে, সমৃদ্ধ ত্রিপুরা রাজ্য গঠনই বিজেপির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব অনেক নিশ্চিত হবে।

অভিমন্যু গুহ

নরেন্দ্র মোদী সরকারের লক্ষ্য এখন উত্তর-পূর্ব ভারত। সেখানকার তিনটি রাজ্য ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডে নির্বাচন আসন্ন। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে, যে দল যখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকে উত্তর-পূর্বের রাজনৈতিক পটচিত্রের পরিবর্তন ঠিক সেইভাবেই সংঘটিত হয়। কিন্তু উত্তর-পূর্বে বিজেপির ক্ষমতায়নকে কেবল রাজনৈতিক অভিসন্ধি হিসেবে দেখলে ভুল হবে। স্বাধীনতার পর থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের বাকি ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার একটি দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। যে কারণেই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি বাকি ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী এক আন্দোলনেরও সৃষ্টি হয় যা ভারতের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে বিপর্যস্ত করে।

বিজেপির চ্যালেঞ্জ মুখ্যত এই জায়গাতেই। ২০১৬-র মে-তে অসমে কংগ্রেসের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজেপি। এর ছ' মাসের মধ্যে অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমা খাণ্ডুর নেতৃত্বে কংগ্রেস বিধায়কদের বিদ্রোহ ও ৪৩ জন বিধায়কের বিজেপিতে যোগদান। গত বছরের মার্চে মণিপুরে বিজেপির সরকার গঠন। সব মিলিয়ে উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের মধ্যে তিনটি বিজেপির দখলে। বাকি চারটির মধ্যে তিনটির নির্বাচন সামনে। ১৮ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা, ২৭ ফেব্রুয়ারি মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডে। এই তিনটিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারবে কিনা, সেটা সময়ই বলবে। কিন্তু বিজেপি যে এগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক হবে তা স্পষ্ট।

বিজেপির এই সাফল্য ও আগামীদিনে আরও বেশি সফলতা ভারতের সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকেই আরও দৃঢ় করবে। উত্তর-পূর্বের প্রধান সমস্যা বিচ্ছিন্নতাবাদ। কায়েমি স্বার্থের জন্য দেশি-বিদেশি মহল থেকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে ক্রমশ উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি একে প্রতিরোধ করতে পারবে বলেই দেশবাসী মনে করেন। যে স্বার্থের জন্য এতদিন উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাকি ভারতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল, তার প্রতিরোধ আর এস এস মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন সংগঠন বহুদিন ধরে করে চলেছে। যেমন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ 'সিল' অর্থাৎ এস ই আর এল (স্টুডেন্ট এক্সপেরিয়েন্স ইন্টার স্টেট লিভিং বা আন্তঃরাজ্য ছাত্র-জীবন দর্শন) প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বের সঙ্গে গোটা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের একাত্মতা তৈরির কাজ প্রায় ৩০ বছর সময় ধরে করে চলেছে।

সুতরাং উত্তর-পূর্বে বিজেপির সাফল্য কেবল কেন্দ্রে তাদের ক্ষমতায় থাকার জন্য এটা ভাবলে ভুল হবে। উত্তর-পূর্বকে বাকি ভারতের সঙ্গে একাত্ম করবার কাজ বিজেপি বা এবিভিপি এছাড়াও মূলত বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা বিদ্যাভারতীর মতো জাতীয়তাবাদী সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই করেছে। আজকের রাজনৈতিক সাফল্য হয়তো এই সামাজিক সাফল্যকেও স্বীকৃতি দেবে। অসমে বাঙালি খেদা-র জুজু দেখিয়ে আপামর বাঙালির সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা খেলবার চেষ্টা চিরকালের দেশদ্রোহী বামপন্থীরা করেছে সাম্প্রতিককালে। 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি', 'অরুণাচল মাঙ্গে আজাদি' এই স্লোগানগুলির জন্ম তারা বহু আগেই দিয়েছিল। অরুণাচলের তাওয়াংকে চীনের হাতে তুলে দেওয়া ছিল তাদের একমাত্র স্বপ্ন।

কিন্তু উত্তর-পূর্বে বিজেপি-র বাড়বাড়ন্ত এই স্বপ্নকে আপাতত

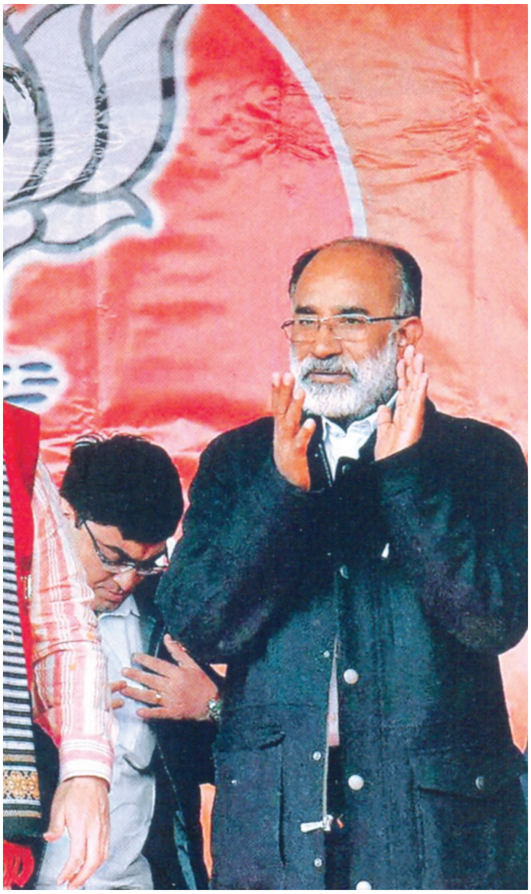

দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে। বিশেষ করে তাদের ক্ষমতায় থাকা ত্রিপুরায়। ৩২ শতাংশ মানুষ জনজাতি। যাদের ক্ষেপিয়ে তুলে আর তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকামী মানসিকতার জন্ম দিয়ে বছরের পর বছর ক্ষমতা ভোগ করেছে বামপন্থীরা। এবারের ভোটে বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে ইন্ডিজেনাস পিপল'স ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (আই পি এফ টি)। জনজাতিদের এই সংগঠনটির প্রবল ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ২০টি সংরক্ষিত আসনে। নির্বাচিত জনজাতি নেতারা বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করে এই দলে যোগ দেন। ২০১৫-র মে মাসে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ভোটে ২৮টি আসনের প্রত্যেকটিতেই বামেরা জিতলেও তাদের ভোট শতাংশ কমে যায় বিপুলভাবে, ৬৪ শতাংশ থেকে ৫৪ শতাংশে নেমে যায়।

আই পি এফ টি জনজাতিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে 'ত্রিপরাল্যান্ডে'র দাবি তুলেছিল তাদের জন্য পৃথকভাবে। এখনও সেই দাবি থেকে সরে না এলেও বিজেপির প্রভাবে তাদের সুর এখন যথেষ্ট নরম। বিজেপি ক্ষমতায় এলে জনজাতিদের ওপর বাম জমানার অবিচারের প্রতিকার করতে পারলে তারা ওই দাবি থেকে সরে বাঙালি অধিবাসীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারবে। দশকের পর দশক সিপিএম এদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাই এখনও চুপিসারে বাঙালিদের মধ্যে 'অসমে বাঙালি খেদা'-র মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে জনজাতিদের মধ্যে বাঙালি- বিদ্বেষ তৈরিতেও সচেষ্ট তারা।

ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের সদস্য এনিয়ে মুখ খুলেছেন। কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ হয়েও তিনি জনজাতির সঙ্গে অসাম্য-আচরণের জন্য কংগ্রেসের দিকেই আঙুল তুলেছেন। সব মিলিয়ে বামেদের বিভেদমূলক শাসন নীতি (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে এসে গেছে। কংগ্রেসের ছয় বিধায়কের তৃণমূল ঘুরে বিজেপিতে আসা এবং জোট তৈরির আগে আই পি এফ টি-র পাঁচ নেতার বিজেপিতে যোগদান সাংগঠনিক ভাবে বিজেপিকে শক্তিশালী করেছে। বাঙালি ও ত্রিপুরী জনজাতির মধ্যে বিভেদের বিষবাষ্প সৃষ্টি না করে, সমৃদ্ধ ত্রিপুরা রাজ্য গঠনই বিজেপির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব অনেক নিশ্চিত হবে।

এই একই কথা প্রযোজ্য নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রেও। বিচ্ছিন্নতাবাদের সুযোগ নিয়ে সেখানকার নাগরিকদের খ্রিস্টান করা হয়েছে। এখন চেষ্টা চলেছে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার। নাগাল্যান্ড পিপল'স ফ্রন্টের সঙ্গে যদিও বিজেপির জোট ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু এন পি এফ নিজেই সংকটে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন পি এফের নেইফিউ রিও বর্তমানে নবগঠিত এন ডি পি পি (ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি)-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। এন ডি পিপির সঙ্গে বিজেপির জোট সম্ভাবনা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরণ রিজিজু নাগাল্যান্ডবাসীর কাছে একপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ফেলেছেন যে রাজ্যে এন ডি এই সরকার গঠন করবে।

নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে গো-মাংস নিষিদ্ধ করা, চার্চ আক্রমণ নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্থানীয়দের ক্ষেপিয়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে। মেঘালয়ের কংগ্রেস সরকারও তার ক্ষমতা কায়েমের লক্ষ্যে এসবে মদত দিচ্ছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যেমন ঘোরালো, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, তেমনি বিজেপির নির্বাচনী সাফল্যে অনেকাংশে নির্ভর করবে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথটি।

কিরীট প্রদ্যোৎদেববর্মন মাণিক্য— ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিনিধি। ত্রিপুরায় বামেদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেসের ভূমিকায় তিনি অসন্তুষ্ট। তাঁর মতে এবারের নির্বাচনে বিজেপিই ফেবারিট। তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন কিনা তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। তবে যাই হোক না কেন প্রকাশ্যে তিনি বলেছেন— 'আমি শুধু চাই ত্রিপুরাকে বাম শাসনমুক্ত করতে। গত ২৫ বছরে বামেরা ত্রিপুরার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সর্বনাশ করে দিয়েছে।

এই সময়

গাড়ি যখন হাতুড়ি

হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ভাঙার কথা সবাই জানে। কিন্তু হাইস্পিডে এবং ব্যাক গিয়ারে গাড়ি

চালিয়ে দরজা ভাঙার ঘটনা খুব একটা শোনা যায় না। ঘটনাটি ইংলন্ডের। কয়েকজন দুষ্কৃতী এইভাবে দরজা ভেঙে সুপারমার্কেটে ঢুকে একটি আস্ত এটিএম তুলে নিয়ে চলে গেছে।

তিমি উবাচ

চোদ্দ বছর বয়েসি এক তিমির মুখে কথা ফুটেছে। যেসব গবেষকেরা তাকে নিয়ে কাজ

করছিলেন তারা জানিয়েছেন সে দিব্যি 'হ্যালো, অ্যানি, বাই বাই' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করছে। কিছু প্রজাতির পাখি মানুষের কথা নকল করতে পারে। তিমি এই প্রথম।

আক্কেলগুড়ুম

অনলাইন মার্কেটপ্লেস হিসেবে ফ্লিপকার্টের নাম প্রায়ই শোনা যায়। মুম্বই নিবাসী এক

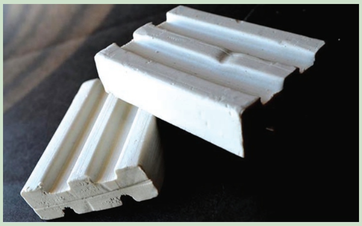

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আই ফোন ৮ কিনবেন বলে ফ্লিপকার্টে অর্ডার দিয়েছিলেন। পেয়েছেন দুটি ডিটারজেন্ট বার। হতভাগ্য ক্রেতার নাম তাবরেজ মেহবুব। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা

গত ১০ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার অগ্রণী সংগঠন বিবেকানন্দ পাঠচক্র আয়োজিত ও রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলার শুভ উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-অধ্যক্ষ স্বামী শিবময়ানন্দ। পাঁচদিন ব্যাপী এই মেলার স্বাগত ভাষণে পাঠচক্রের সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন, 'মেলা অর্থে মিলন। এই মেলার ভিতর দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মিলন এবং স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের কাজই আমরা করছি।'

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তিনি বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে যুব সমাজকে। স্বামীজী

দেশগঠনের কথা বলেছিলেন। এই কাজে যুব সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে।' বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রাক্তন এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের যুগোপযোগিতার ওপর জোর দেন। প্রতিবারের মতো এবার বিবেকানন্দ সঙ্গীত সম্মান প্রদান করা হয় স্বনামধন্য নৃত্যসাধিকা ড. থাঙ্কমণি কুট্টিকে।

মিলন মেলায় বিভিন্ন দিনে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ, স্বামী প্রতিবোধানন্দ, অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত, সমীর গাঙ্গুলী, কর্নেল সব্যসাচী বাগচী, ড. সোমনাথ ভট্টাচার্য, পল্লবী বসু দত্ত, ড. হরিপ্রসাদ কানোরিয়া, অনুপ গুপ্ত প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সংস্কার ভারতীর উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ হাওড়া, বেহালা, দক্ষিণ কলকাতা ও বাগুইহাটি শাখা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সন্তুর বাদনে ছিলেন পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য ও প্রথিতযশা শিল্পীরা। সমবেত সঙ্গীত ও সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন বিবেকানন্দ পাঠচক্রের শিল্পী সদস্য-সদস্যারা। ক্রীড়া ভারতীর শারীরিক ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন 'বীরপূজা' দিবসটিকে (১১ জানুয়ারি) যথাযথ করে তোলে। এই মিলন মেলার অন্যতম সহযোগী ছিল সংস্কার ভারতী।

মালদায় সংস্কৃত জনপদ সম্মেলন

গত ২৩ জানুয়ারি মালদার বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলে সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে সংস্কৃত জনপদ সম্মেলন আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সহ-প্রধান বিশিষ্ট শিক্ষক তথা সমাজসেবী ও ইতিহাসবিদ ড. তুষারকান্তি ঘোষ, কমলাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের

এই সময়

ডাঙায় ছিপ

অস্ট্রেলিয়া থেকে নানা মজার ঘটনার খবর আসে। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন,

বন্যার জলে টইটম্বুর রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাছ ধরা। ভদ্রলোকের নাম ড্যামিয়েন মঙ্ক। গিয়েছিলেন বন্যাদুর্গত রাস্তার ছবি তুলতে। জল দেখে লোভ সামলাতে পারেননি। বাড়ি থেকে ছিপ এনে মাছ ধরতে শুরু করেন।

লেবুচোর

স্পেনের সেভেনে শহরের পুলিশ দুটি গাড়ি আটক করেছে। চার হাজার কেজি কমলালেবু

গাড়িতে ভরে দুষ্কৃতীরা পালাচ্ছিল। গাড়ি দুটি বারবার রাস্তা বদল করায় টহলদার পুলিশের সন্দেহ হয়। কিছুদূর অনুসরণ করার পর পুলিশ তাদের ধরে ফেলে। গ্রেপ্তার হয়েছে পাঁচজন।

খুড়োর কল

চীনের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের এমন এক অঙ্ক করতে দেওয়া

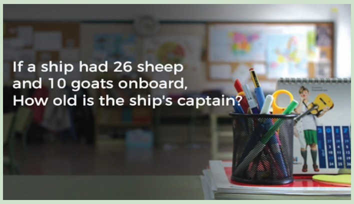

হয়েছে যা বড়দের পক্ষেও করা অসম্ভব। অঙ্কের প্রশ্নটি এই রকম : যদি একটি জাহাজে ২৬টি ভেড়া এবং ১০টি ছাগল থাকে তাহলে ওই জাহাজের ক্যাপ্টেনের বয়েস কত?

সমাবেশ -সমাচার

শিক্ষক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্বস্তিকা'র সাংবাদিক তরুণকুমার পণ্ডিত, সংস্কৃতভারতী উত্তরবঙ্গের সংগঠন মন্ত্রী কমল শর্মা প্রমুখ। সম্মেলনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংস্কৃত ছাত্র, সংস্কৃত শিক্ষক এবং সংস্কৃত অনুরাগীদের সংখ্যা ছিল ৫০০। অনুষ্ঠানে সাহাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্কৃত ভাষার গানে নৃত্য পরিবেশন করে।

ড. তুষারকান্তি ঘোষ প্রাঞ্জল ভাষণের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব ও প্রাচীন পরম্পরার কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি সংস্কৃতের সর্বজনীনতা সম্পর্কে দর্শকদের অবগত করান। কমল শর্মা সংস্কৃত ভাষার বৈজ্ঞানিকতা ও অতি সহজে মাত্র দশদিনে ব্যাকরণের কাঠিন্য ছাড়া মাত্র দু'ঘণ্টায় সংস্কৃত কীভাবে শেখা যায় তার আকর্ষক উদাহরণ দিয়ে দর্শকদের স্তম্ভিত করেন।

শেওড়াফুলি স্বামীজী-নেতাজী পাঠাগারের দশমবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

শেওড়াফুলি স্বামীজী-নেতাজী পাঠাগারের দশমবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ২১ জানুয়ারি জনসচেতনতা মূলক শোভাযাত্রা, ২২ জানুয়ারি ভারতমাতার স্বরূপে মা সরস্বতীর

আরাধনা ও ২৩ জানুয়ারি অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ করা হয়।

জনসচেতনতা মূলক শোভাযাত্রায় ৪৫০ জনের অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে। তাতে শেওড়াফুলি-বৈদ্যবাটি অঞ্চলের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বিনা যুদ্ধে ভারত দখল, সন্ত্রাসবাদ, পরিবেশ সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণ, স্বচ্ছতা, মাতৃজাতির সম্মান বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য চিত্র সংবলিত ফ্লেক্স ব্যবহার করা হয়। ভারতমাতা ও সরস্বতী পূজায় যজ্ঞানুষ্ঠান এক বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। ৭০টি পরিবার এই যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে নরনারায়ণ সেবায় ২০০০ জনেরও অধিক মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২৩ জানুয়ারি পুস্তক বিতরণী অনুষ্ঠানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ৫৫০ জন শিক্ষার্থীকে স্কুলব্যাগ, পুস্তক ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভাবা অ্যাটমিক এনার্জি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের বৈজ্ঞানিক ড. নিশীথ দাস। অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়

হৃদয়বান

ইংলন্ডের এলা জোহানেসেনের মতো অভিজ্ঞতা কম মানুষেরই হয়। এলার মা কোনওভাবে ৩৫ পাউন্ড হারিয়ে ফেলেন। মায়ের ফোন যখন এল এলা তখন ট্রেনে। কথা বলে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে দেখে কোনও এক সহৃদয় যাত্রী ৩৫ পাউন্ডের তিনগুণ অর্থ তার জন্য রেখে গেছেন।

কাশ্মীরে সড়ক

জম্মু ও কাশ্মীরে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। ২৩৭৩টি অনুমোদিত সড়ক নির্মাণ

প্রকল্পের ৭৯৫টির কাজ গত দু'বছরে শেষ হয়েছে। এই তথ্য দিয়েছে রাজ্যের পূর্তবিভাগের প্রতিমন্ত্রী সুনীল শর্মা। ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিধায়ক মুবারক ভলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা জানান।

সবুজে রেহাই

সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা গেছে পাতা-সহ সবুজ শাকসবজি নিয়মিত খেলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা ৬৪ শতাংশ পর্যন্ত কমানো

যায়। গবেষকেরা পঞ্চাশোর্ধ ৬৮২ জন রোগীর সঙ্গে কথা বলেছেন। সবুজের উপকারিতা বিষয়ক কিছু পরীক্ষা চালিয়েছেন। রোগীরা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের সমস্যায় ভুগছেন।

সমাবেশ -সমাচার

রানিগঞ্জে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্মেলন

'সুরক্ষিত নারী— সুরক্ষিত বাংলা'র দাবি নিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৩৫তম রাজ্য সম্মেলন গত ২৯ থেকে ৩১ জানুয়ারি পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। রাজ্য সম্মেলনে এই বছরের নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে কলকাতার অধ্যাপক ডাঃ রমণ কুমার ত্রিবেদী এবং রাজ্য সম্পাদক হিসেবে জলপাইগুড়ির সপ্তর্ষি

সরকার সর্বসম্মত ভাবে নির্বাচিত হন। রাজ্য সম্মেলনে চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাব— বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ। দ্বিতীয় প্রস্তাব— নারী-সুরক্ষায় অগ্রাধিকার। তৃতীয় প্রস্তাব— পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা। চতুর্থ প্রস্তাব— পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার বেহাল দশা'য় উদ্বেগ প্রকাশ। রাজ্য সম্মেলনে ভগিনী নিবেদিতার ১৫০তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে ভগিনী নিবেদিতার জীবনাদর্শ নিয়ে নারীশক্তির উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সম্মেলনে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল নারী সমাজের উপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন শোভাযাত্রা এবং প্রকাশ্য জনসভা হয়।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সেবাকাজ

গত ১১ জানুয়ারি, ২০১৮ কলকাতা শ্যামপুকুরের প্রদীপ সঙ্ঘের পরিচালনায় একটি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৭১ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় ও ৬৫ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়। ৩৮ জনের বিএমডি, ৭ জনের ইসিজি, ২৫ জনের নিউরো এবং ৩৮ জনের অর্থোপেডিক পরীক্ষা করা হয়। গত ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ হাওড়ার ঘোড়াবেড়িয়া চিতনান দ্বীপে চিননান ঘোড়াবেড়িয়া চ্যারিটেবল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ১২২ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং ১০৫ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়। এছাড়া ৫০ জনের বিএমডি, ১৯ জনের নিউরো, ১১ জনের ইসিজি, ৪৫ জনের অর্থোপেডিক এবং ৩৭ জনের জেনারেল পরীক্ষা করা হয়। গত ২৮ জানুয়ারি বেহালা ১২৪নং ওয়ার্ড বিজেপির পক্ষ থেকেও একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এখানে ১২৫ জনের ১০০ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়। ১০ জনের ইসিজি এবং ৩৬ জনের জেনারেল পরীক্ষা করা হয়।

স্বাস্থ্য-পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশ্ব বাজার ধরতেই পারে ভারত

আমার জীবনের প্রারম্ভিক বছরগুলির বেশিরভাগটাই কেটেছে গ্রামীণ ভারতে। আমি বেড়ে উঠেছি ভারতীয় কৃষকদের মাঝাখানে। কিন্তু আমি আজ কিছুতেই মনে করে বলতে পারব না, আদৌ আমি এমন কোনও কৃষককে দেখেছিলাম যে নিজেকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকারী বলে মনে করত। সকলেরই ছিল টাকা কড়ির অস্বাচ্ছন্দ্য।

আজও আমাদের প্রকৃতি অর্থাৎ বৃষ্টি-নির্ভর অর্থনীতি। বৃষ্টি নেই, মাঠে শস্য নেই, মানে হাতে টাকা নেই। ভয়ঙ্কর বৃষ্টি, শস্য নষ্ট, হাতে টাকা এল না। পরিমাণ মাফিক বৃষ্টি হলো, ফলে বাম্পার উৎপাদন হলো। পণ্যের দাম পড়ে গেল, কেননা অত মাল কেনার লোক নেই। ফলে হাতে টাকা নেই। একজন কৃষকের দেউলে হয়ে যাওয়া কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। মোট জিডিপি-র মাত্র ১৩.৭ শতাংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে এলেও কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে (employment) কৃষির অবদান ৫০ শতাংশ। আমেরিকায় কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষের পরিমাণ জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ। এই পর্যালোচনা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, কৃষক পরিবারগুলিকে কৃষিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে অর্থনীতির অন্য ক্ষেত্রে কাজ দেওয়া ছাড়া গতি নেই।

মানুষের চলতি ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে এই পরিসংখ্যানগুলি। বিশ্বে আই টি ক্ষেত্রে সমগ্র লগ্নি ও ব্যবসার পরিমাণ ৩.৪ ট্রিলন ডলার, তৈলক্ষেত্রে ২ ট্রিলন ডলার, অটোমোবাইল ক্ষেত্রে ২ ট্রিলন ডলার, আর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই পরিমাণ হলো বিশাল— ৮ ট্রিলন ডলার। ব্রিটেন ও আমেরিকায় আজকের তারিখে সর্বাপেক্ষা বেশি চাকরি তৈরি হয় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। বিলেতের National Health Service বিশ্বের সব থেকে বড় চাকরিদাতার তালিকায় পঞ্চমে রয়েছে।

আমাদের দেশে সব থেকে জনপ্রিয় গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থা মারুতিতে সরাসরি চাকরি করে মাত্র ১৩৫০০ কর্মী, যেখানে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ১৮৭৮ কোটি টাকার মোট ব্যবসা করে নারায়ণ হেলথ নিয়োগ করেছে ১৫৫০০ কর্মীকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা অর্থের তুলনায় সেখানে তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা অনুপাতিকভাবে অনেক বেশি। এই চাকুরেদের বড় অংশই আবার অর্ধপ্রশিক্ষিত বা আদৌ প্রশিক্ষিত নয়। বলে দেওয়ার দরকার করে না যে, এদেরই চাকরির দরকার সবচেয়ে বেশি।

মাঙ্গালোরে '৪০ দিনের বিশেষ মহিলা' নামে এক ধরনের বিরাট মহিলা বাহিনী রয়েছেন যাদের কাজ ওই দিনগুলিতে মা ও সদ্যোজাত শিশুর যত্ন নেওয়া। এক্ষেত্রে যোগ্যতা মান কেবলমাত্র ওই মহিলারা যেন নিজেরা আগে মা হয়ে থাকেন। আর মাইনে? ৪০ দিনের জন্য ৫৫ হাজার টাকা। এই ধরনের চাকরি নির্দিষ্ট ঘড়ি ঘণ্টা ধরে বরাবর করতে হয় না। কাজ ধরা-ছাড়ার স্বাধীনতা আছে। যা গ্রামীণ মহিলাদের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত হতে পারে। ধরে নেওয়া যাক আমাদের দেশে যত জন প্রতি মাসে মাতৃত্বে পৌঁছন তাদের মাত্র ১০ শতাংশের পক্ষে এই ধরনের নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে। তাহলেও কিন্তু আমরা বেশ কয়েক লক্ষ ভালো মাইনের যথেষ্ট নমনীয় শর্তের চাকরি দিতে পারি। এই কাজকে বাড়তি উৎসাহ দিতে গেলে দরকার স্বল্পমেয়াদি কিছু সাধারণ প্রশিক্ষণ, যার সঙ্গে থাকবে নির্দিষ্ট Portal ও কাজকর্মে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা। সবচেয়ে আদর্শ পরিস্থিতিতে একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে লাগে চারজন নার্স, চারজন টেকনিশিয়ান এবং পাঁচজন প্রশাসক। এদের সকলেরই কাজ করতে

অতিথি কলম

দেবী শেঠি

> “দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের চিকিৎসা, শিক্ষা অভিজাত শ্রেণী কেন্দ্রিক বিষয় হয়ে উঠেছে। এই elitist ব্যবস্থার বিপরীতে আমরা যদি একটা বিকল্প গ্রামকেন্দ্রিক চিকিৎসা শিক্ষা চালু করতে পারি, অবশ্যই যার খরচ সাধ্যের মধ্যে থাকবে এবং মূলত পাশ্চাত্য চিকিৎসা চাহিদার দিকে নজর রেখেই তৈরি হবে, তাহলে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর বিরাট প্রভাব পড়বে। আমরা ভারতকে বিশ্বের প্রধান পরিষেবা সরবরাহকারী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।”

গেলে আবশ্যিকভাবে লাগবে লাইসেন্স। আর সঙ্গে সঙ্গেই লোকের সরবরাহে টান পড়বে। মার্কিন Bureau of Labour Statistics-এর তথ্য অনুযায়ী সেখানকার ২০টি সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে বাড়া পেশার ক্ষেত্রে ৯টিই স্বাস্থ্যক্ষেত্র। অথচ এই ৯টি পেশার একটিও চালু করার কোনও উদ্যোগই আমাদের দেশে নেই। নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সংস্থার দ্বারা অনুমোদন পেলে তবেই skill develpoment- এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। গ্রামীণ গরিব মানুষদের যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ করে তুলতে যে টাকার প্রয়োজন হবে তার জোগাড় করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সারা দেশে ৫০০০ এমন হাসপাতাল আছে যেখানে এই ধরনের ঘরোয়া স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুবিধে আছে। কিন্তু সরকার বা যে কোনও দাতব্য সংস্থা থেকে এই প্রশিক্ষণ অর্থের বিনিময়ে বা শিক্ষা ঋণ হিসেবে মঞ্জুরি নিতে হবে।

ভারতে এখনই ২০ লক্ষ নার্সের প্রয়োজন আছে। সারা বিশ্বে এখন নার্স আছে ৯০ লক্ষ। ভারতে নার্সিং পেশার জনপ্রিয়তা তেমন বাড়ছে না বা যথাযথ প্রতিভাবানদের এ পেশায় না আসার কারণ ভবিষ্যতে কেরিয়ার বৃদ্ধির নিশ্চয়তা না থাকা। যুক্তরাষ্ট্রে ৬৭ শতাংশ অজ্ঞান করার পদ্ধতি প্রকরণ নার্সরাই করে থাকেন। আর ভারতে ২০ বছর ধরে আইসিইউ-তে কাজ করে আসছেন এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নার্সের একটি পেনকিলার লেখার আইনসঙ্গত অধিকার পর্যন্ত নেই। একজন ২৫ বছর বয়সি ICU কাজে অভিজ্ঞ নার্স যথাযথ licensing প্রথা চালু থাকলে মাসে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে পারেন। দরকার শুধু নিয়ন্ত্রণের নিয়ম মেনে পরিষেবাকে inclusive করে তোলা— তাকে কেবলমাত্র ডাক্তারদের আওতাধীন বলে বাইরে রাখা নয়।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন অনুযায়ী আগামী তেরো বছরের মধ্যে বিশ্ব জুড়ে ৮০.২ মিলিয়ন (৮ কোটির কিছু বেশি) স্বাস্থ্য পরিষেবকের প্রয়োজন হবে। বিশ্বের ধনী দেশগুলির নাগরিকদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার চাকরি আদৌ আকর্ষণীয় নয়। এখন দরকার গ্রামের যুব সমাজকে ডাক্তার, নার্স বা প্যারা টিচার্স-এর মতো paramedics হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশ্বের চাহিদার উপযুক্ত করে তোলা। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। ছোট্ট দেশ কিউবা থেকে ৪৫ হাজার ডাক্তার, নার্স মধ্য আমেরিকায় চাকুরিরত। তাদের সম্মিলিত বাৎসরিক আয় ৮ বিলিয়ন ডলার। ফিলিপাইন তাদের বিদেশে নিযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবকদের থেকে বছরে ২৯.৭ বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স পায়। তাদের ১.৫০ লক্ষ নার্স ও ১৮ হাজার ডাক্তারবাবু বিদেশে কর্মরত।

আমাদের ৬০০ জেলা হাসপাতালকে এখনই নার্সিং ও প্যারা মেডিকাল ফোর্সের প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করে সেখানে ৫০ লক্ষ ডাক্তার নার্স ও প্যারা মেডিক তৈরির কাজ শুরু করা উচিত যাতে তারা বিশ্বব্যাপী কাজের চাহিদা মেটাতে পারে। আর এটা করতে পারলে তারা বছরে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মহার্ঘ বিদেশি অর্থ প্রতি বছর দেশে পাঠাতে পারবে। অবশ্যই কিছুটা সময়ের পর। Medical School তৈরি করতে কখনই ৪০০ কোটি টাকা খরচ লাগে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে ৩৫টি মেডিক্যাল স্কুল আছে, যারা আমেরিকায় কাজ করার উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবক তৈরি করে। এই স্কুলগুলি আবার বড় বড় মলের মধ্যে ৫০ হাজার ফুট জায়গা ভাড়া নিয়ে তৈরি, যেখানে অধিকাংশ ভারতীয় ডাক্তাররাই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

আমরা প্রথমেই নকশাল অধ্যুষিত ৬০টি জেলায় ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ডাক্তার নার্স, প্যারা মেডিক তৈরির কাজে হাত দিতে পারি। প্রাথমিকভাবে তারা যাতে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় কাজ করার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে পারে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হোক। গ্রামের নিতান্ত গরিব পরিবারের ছেলেদেরই ডাক্তার হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক, কেননা আমি দেখেছি সারা বিশ্বের সেরা ডাক্তাররা যাদের আঙুলে জাদু আছে তারা সকলেই নিতান্ত বঞ্চিত পরিবার থেকে উঠে এসেছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের চিকিৎসা, শিক্ষা অভিজাত শ্রেণী কেন্দ্রিক বিষয় হয়ে উঠেছে। এই elitist ব্যবস্থার বিপরীতে আমরা যদি একটা বিকল্প গ্রামকেন্দ্রিক চিকিৎসা শিক্ষা চালু করতে পারি, অবশ্যই যার খরচ সাধ্যের মধ্যে থাকবে এবং মূলত পাশ্চাত্য চিকিৎসা চাহিদার দিকে নজর রেখেই তৈরি হবে, তাহলে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর বিরাট প্রভাব পড়বে। আমরা ভারতকে বিশ্বের প্রধান পরিষেবা সরবরাহকারী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব। উৎপাদন ক্ষেত্রে চীন যেমন নিজেকে তৈরি করেছে। বিদেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের কর্মীদের মাইনে অন্যসব ক্ষেত্র থেকে বেশি। Cayman Island-এ আমাদের হাসপাতালে কর্মরত এক ২৪ বছর বয়সি কেরেলীয় নার্স সম্প্রতি তার বাবা মাকে ছুটি কাটাতে Disney Land থেকে ঘুরিয়ে আনল।

ভারতে মোট কুড়ি লক্ষ শয্যার হাসপাতাল থাকায় সহজেই বিশ্ব-চাহিদা মেটাবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবক তৈরি করা যায়। শুধুমাত্র আমাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সরকারি নিয়মাবলী ও আইন কানুনে কিছু পরিবর্তন এনে। ঠিক 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র মতো সারভড বাই ইন্ডিয়ান-এর স্লোগানটি তোলা যেতে পারে। আমরা শিল্প বিপ্লবের বাস ধরতে পারিনি, কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপ্লব আনার বাস আমরা ধরতেই পারি। এখানে কিন্তু বিশেষ টাকা খরচ নেই। শুধু দরকার উদ্যমী ও স্বপ্ন দেখা যুবক-যুবতীদের, যার কোনও অভাব আমাদের নেই।

(লেখক প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

‘জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না’

২০১৪ লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৮২টি লোকসভার আসনে জয়ী হয়। বিরোধী ভোটের শতাংশ বলছে—বেশি মানুষ বিজেপির বিপক্ষে ভোট দিয়েছে—কিন্তু তারা কখনই একত্রিত হতে পারেনি এবং পারবেও না। অন্যদিকে, গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৮৬ বিধানসভা আসনের মধ্যে ৯৯টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছে ৪৯.১ শতাংশ ভোট পেয়ে, যা সংসদীয় রাজনীতিতে বিরল ঘটনা। বিরোধীরা বলছে বিজেপি কম আসন পেয়েছে। বেশি শতাংশ ভোট বিবেচনায় আনছে না। কারণ এরা গ্লাসের জল ভরা অংশ দেখতে পারে না, গ্লাসের খালি অংশের দিকে এদের নজর।

গুজরাটের ভোটপর্ব মিটতেই পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় সবং বিধানসভায় উপনির্বাচন হয়েছে—চতুর্মুখী লড়াইতে শাসকদল জয় পেয়েছে, কিন্তু উল্লাস ম্লান হয়েছে উল্কার গতিতে বিজেপি’র ভোটবৃদ্ধিতে। বিজেপির ভোট (১.০৩%) শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৮ শতাংশ এবং প্রাপ্ত ভোট ২,৫০৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৭,৪১৬। কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেছিল। আজ কংগ্রেসের ছয় বারের এম এল এ মানস ভুঁইয়া তৃণমূলে যোগ দেওয়াতে কংগ্রেস, ভুল হলো রাহুল গান্ধীর নব্য কংগ্রেস চতুর্থ স্থান কৃতিত্বের সঙ্গে অধিকার করেছে। ১৯২৯ সালে লাহোরে ইরাবতীর তীরে মতিলাল নেহরুর কাছ থেকে জওহরলাল জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পতাকা নিয়েছিলেন। আর ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী পেরিয়ে সোনিয়া গান্ধীর কাছ থেকে দিল্লিতে ২০১৭ সালে কংগ্রেসের পতাকা নিলেন রাহুল গান্ধী। পরিবারতন্ত্রে, বলা যায় গণতন্ত্রহীন দলে এ অবস্থা হবে তা বলাই বাহুল্য।

সবং বিধানসভার উপনির্বাচনে মাত্র এক বছরের মধ্যে বিজেপির প্রায় ৩৫০০০ ভোট বৃদ্ধিতে তৃণমূলের হাড়কাঁপুনি শুরু হয়েছে। আগে ভোট লুট, ভোটার লিস্টে কারচুপি তৃণমূলের দিদি বা পিসির নিত্যদিনের অভিযোগ ছিল। এখন সিপিএমের কায়দায় একই ঘৃণ্য কাজ করছে তৃণমূল, বলা ভালো নিকৃষ্ট সিপিএম! অন্যান্য নির্বাচনের মতো সবংয়ে উপনির্বাচনেও ৩০৬টি বুথের মধ্যে ১২৮টি বুথে অবাধে ভোট লুট হয়েছে। তা সত্ত্বেও, চারটি অঞ্চলে পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল—যদিও ভোট করিয়েছে তৃণমূল, ভোট বেড়েছে বিজেপি’র। আর এর ফলে ঔরঙ্গজেবের মতো তৃণমূল নিজের ছায়াকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তৃণমূল নিজের ভেতরে বিজেপি খুঁজতে ব্যস্ত। বিজেপি’র ভূত খুঁজে দিতে পারলে ইনাম পাওয়া যাবে—ফলে সবাই সবাইকে ভূত ভাবছে। ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গাত্রে হলো ব্যথা।

২৯৬ ও ২৯৭ ওয়ার্ডে তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট কেশপুর- গড়বেতার স্মৃতি উস্কে দিয়েছে। ২০১৪ সালে মানস ভুঁইয়া পেয়েছিলেন যথাক্রমে ১১১ ও ৪০টি ভোট। সিপিএম পেয়েছিল ২৮২ ও ২৪৬টি ভোট। এবার গীতারানী ভুঁইয়া উন্মাদদের উল্লাসের বানে ভেসে নাচতে নাচতে ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ৬৭৮ ও ৪৫৮টি। লোকসভাতে তৃণমূলের দেব ও কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের থেকে যা বেশি।

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে সবং বিধানসভায় বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোট : কংগ্রেস ৩২.৩১ শতাংশ, বাম (সিপিএম) ৩২.২৫ শতাংশ, তৃণমূল ৩০.৪১ শতাংশ, বিজেপি ২.২ শতাংশ।

সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়, বলপাই প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সালাবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজেপি’র ভোটবৃদ্ধি তৃণমূলের জয় থেকেও ভয় বেশি বাড়িয়ে তুলেছে।

সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয় বুথে বিজেপি’র ভোট বৃদ্ধি— ২০১৪-তে ২৬, ২০১৬-তে ৪৫, ২০১৭-তে ২৪৬। বলপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়— ২০১৪-তে ০৯, ২০১৬-তে ১০, ২০১৭-তে ৬৪। সালবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়--- ২০১৪-তে ১৮, ২০১৬-তে ২৫, ২০১৭-তে ২৪৯।

বিজেপি ‘সবং মডেল’ কাজে লাগিয়ে ২ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ বাড়িয়ে নিয়েছে ১১০ থেকে ১২০টি বুথে। মনে রাখতে হবে, ২০১৬ সালে কয়েক ডজন বিধানসভা আসনে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান নামমাত্র। সেখানেই তৃণমূল বিপর্যয়ের গন্ধ পাচ্ছে। সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে।

ঝড়ের পাখি কী গান শোনায় তাঁর আশায় বুক বাঁধছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। চাতকের মতো তাকিয়ে আছে ২০১৯ লোকসভা ও তার পরবর্তী ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের দিকে। পশ্চিম দিগন্তে ঝড়ের পূর্বাভাস সবং উপনির্বাচনে বিজেপি’র উত্থান।

—ড. পঙ্কজ কুমার রায়,

বারাসাত

রাজনীতির পঙ্কিলতার আবর্তে শিক্ষার হাল

২৫ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ, বিএসসি প্রথম বর্ষের অনার্স এবং জেনারেল বিষয়ে ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা গেছে কলা বিভাগে অকৃতকার্য হয়েছেন ৫৭ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগে অকৃতকার্য হয়েছেন ২ শতাংশ। কলা বিভাগে ৬৪ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছেন মাত্র ২৮ হাজার পরীক্ষার্থী। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ১৫ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছেন ১১ হাজার পরীক্ষার্থী। সব মিলিয়ে ৭৯ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছেন মাত্র ৩৯ হাজার পরীক্ষার্থী।

এই ফলাফলে শিক্ষার বেরিয়ে পড়া কঙ্কাল আড়াল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাফাই গেয়েছেন এই বলে যে— 'নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থার কারণে অনেক পরীক্ষার্থীরই বোধহয় কোনও সমস্যা হয়েছে। তাই এরকম একটা ফলাফল আমরা পেয়েছি। তবে এরা সকলেই ফেল করেছেন এরকম নয়। বিভিন্ন সমস্যার কারণে কিছু পরীক্ষার্থীর এখনও ফল প্রকাশ করা যায়নি।'

ভাবখানা এই যে, স্বাধীনতার পর রাজ্যে এই প্রথম শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছে। যেন রাজ্যে ইতিপূর্বে ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা দেননি।

তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এহেন ফল প্রকাশের পর বঙ্গবাসী আশ্চর্য হননি। কেননা এটাই হওয়ার ছিল। যদি শিক্ষা জগতের লোক না হয়ে কেউ কোনও শিক্ষালয়ের প্রধান বনে যান তাহলে সেই শিক্ষালয়ের পড়ুয়াদের ফেল করাই তো স্বাভাবিক। অতীতে নামকরা শিক্ষাবিদরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন, দলীয় আনুগত্যের জন্য নয়। বামফ্রন্টের আমলে আমরা দেখেছি মার্কসবাদীরা দলের অনুগতদের উপাচার্য করে দিত। এখন তৃণমূল সেই ধারাই বজায় রেখেছে। রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার জন্য তৃণমূলের শিক্ষানীতি দায়ী। কলেজে কলেজে টিচার্সরুমে ঢুকে শিক্ষকদের মারধর করা, শিক্ষকদের ঘেরাও করে রাখা, আরাবুল-বুলবুলরা জগ ছুঁড়ে মেরে বুঝিয়ে দেয় যে এটাই তৃণমূলের শিক্ষানীতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথায় থাকেন উপাচার্য। সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এখন তৃণমূলের লোক, প্রকৃত শিক্ষাবিদ নন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে সিনেট-সিন্ডিকেট বা কোর্ট এগজিকিউটিভ কাউন্সিল। এগুলোও তৃণমূলের লোকে ভরা। এঁরা দেখেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে কোন শিক্ষক তৃণমূলকে ভোট দেবে, আর কে দেবে না। ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য গুণের থেকে বড় হয় পার্টি সংসর্গ। এই সমস্ত শিক্ষক কোনও সুপরামর্শ গ্রহণ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কী চলবে না, এঁরা ভাবেন না। শুধু দেখেন পার্টি আর ভোট। এই সব শিক্ষক পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতো লম্ফঝম্ফ করতে থাকেন। পদ্মাসনা সরস্বতী এঁদের দেখে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছেন। তাই কলা বিভাগে ৫৭ শতাংশ আর বিজ্ঞানে ২৯ শতাংশ ফেল করে।

এক সময় শিক্ষায় এই রাজ্য ভারতের মধ্যে এক নম্বরে ছিল। কলকাতাকে বলা হতো ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রেসিডেন্সি কলেজে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এদের খুঁজতে গেলে হয়তো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হবে। পক্ষান্তরে এই সমস্ত শিক্ষাঙ্গনের ছাত্ররা নারীদের অন্তর্বাস পরে 'হোক কলরব' নামে মহৎকর্মে লিপ্ত থাকে। তথাপি আমরা গলার শিরা ফুলিয়ে বলব বাংলা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দৌলতে আরও জানা যাচ্ছে যে, ডব্লিউ বি সি এস পরীক্ষায় বসা প্রার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পি এস সি'র নিজস্ব মডেল উত্তরপত্রে অজস্র ভুল থাকছে। অর্থাৎ পরীক্ষায় সঠিক উত্তর লিখলে ফেল করিয়ে দেওয়া হবে এবং তাই করা হয়েছে। যাঁরা ভুল উত্তর লিখেছেন তাঁরা পাশ করেছেন। যাঁরা সঠিক লিখেছেন তাঁরা ফেল। অনেকদিন থেকেই এইরকম চলছিল, তবে ২০১৭ সালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে। মনে হয় অযোগ্য অশিক্ষিত লোক রাজ্য পি এস সি চালাচ্ছে। ফলে আদালতের নির্দেশে ডব্লিউ বি সি এস অফিসার নিয়োগ এখন বন্ধ। অযোগ্যতাই এখন যোগ্যতা। পি এস সি-র চেয়ারম্যান দীপঙ্কর দাশগুপ্ত নীরব, তাঁর সঙ্গে আমাদের ড. দিদিও চুপ। কেন?

২০০৩ সালে অমর্ত্য সেন তাঁর প্রতীচী ট্রাস্টের রিপোর্টে শিক্ষায় রাজ্যের অবনতির জন্য রাজনীতিকেই দায়ী করেছিলেন। সে সময় সিপিএমের নেতারা যেমন সুশিক্ষক চাননি, চেয়েছেন অনুগত পার্টিম্যান, অনুগত উপাচার্য, অনুগত অধ্যক্ষ, অনুগত শিক্ষক তেমনি তৃণমূলিরাও একইভাবে সিপিএমের দেখানো পথে হেঁটে চলেছে। মেধা নয়, শিক্ষা এবং প্রশাসনে দলীয় রাজনীতি আগের মতোই এখনও শেষ কথা বলছে। তাই রাজনীতির পঙ্কিলতার আবর্তে শিক্ষার আজ এই হাল।

—মণীন্দ্রনাথ সাহা,
গাজোল, মালদহ।

হিজাব পরা, নমাজ পড়া সবাইকে মানায় না

সম্প্রতি জয়দেবে বাউল উৎসবে বাউল শিল্পীদের সংবর্ধনা জানানোর সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'গেরুয়া পোশাক পরে ধর্মের নামে যাঁরা আগুন লাগান, তাঁদের গেরুয়া পরার অধিকার নেই।' তিনি আরও বলেন, 'বাউলের পোশাক সকলকে কি মানায়? গেরুয়া পোশাক তাঁদের মানায়, যাঁরা গেরুয়া পরার অধিকারী। গেরুয়া পোশাক পরে ধর্মের নামে যাঁরা আগুন লাগান, তাঁদের গেরুয়া পরার অধিকার থাকতে পারে না।'

মুখ্যমন্ত্রীর ওই বক্তব্য শোনার পর স্বভাবতই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে যা মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছায় না। সেই কথাগুলি আমাদের মতো অতি সাধারণের কানে পৌঁছেছে। সেগুলি মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে জানানোর চেষ্টা করছি।

মুখ্যমন্ত্রী গেরুয়া পোশাক পরা সম্পর্কে যা বলেছেন তার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষেরা বলাবলি করছেন, হিজাব পরা বা নমাজ পড়া কি ব্যানার্জি মহিলার মানায়? গেরুয়ার মতোই হিজাব পরা এবং নমাজ পড়া যাদের মানায় তাদের তা পরা উচিত। কেননা মুসলমান ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের হিজাব পরা ও নমাজ পড়ার অধিকার নেই। মুসলমান সমাজের বাইরে যাঁরা এটা করেন তাঁরা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই করেন না।

—সাতকড়ি শর্মা,
মালদা।

পারম্পরা

শিবরাত্রি পালনের উদ্দেশ্য সকলের মঙ্গলকামনা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

শিবরাত্রি। শুভরাত্রি। সর্বমঙ্গল রাত্রি। এই রাত্রি মুক্তিরাত্রিও বটে। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর এই রাত্রিতে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু অর্চনা করেছিলেন মহেশ্বরের। তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর বলেন, তোমাদের আজকের পূজায় আমি পরিতৃপ্ত, পরমানন্দিত। তাই আজ থেকে এই দিনটি হবে শ্রেষ্ঠতম দিন। আমার অতিপ্রিয় এই তিথিটি চিরকাল আখ্যাত হবে শিবরাত্রি রূপে। সর্বজীবের মুক্তির মাহেন্দ্রক্ষণ হবে এই তিথি।

মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দশীকে শিবরাত্রি হিসেবে চিহ্নিত করার একটি ইতিহাস আছে। একবার ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু নিতান্ত তুচ্ছ কারণে অথবা শিবের মায়াশক্তির প্রভাবেই এক ভয়ঙ্কর কাজে জড়িয়ে পড়লেন। দুজনেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতে থাকেন।

প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি। তাতেও শেষ হয় না বিবাদ। এক সর্বনাশা অহংবোধে দুজনেই হাতে তুলে নেন মহাস্ত্র। বিষ্ণু চালনা করেন মহেশ্বর অস্ত্র আর ব্রহ্মা নিক্ষেপ করেন পাশুপত অস্ত্র। অমোঘ সেই পারমাণবিক অস্ত্রে জগৎ দাঁড়ায় ধ্বংসের মুখে। সেই সময় দেবতারা গিয়ে শরণ নেন মহাদেবের। বলেন, রক্ষা করুন, নাহলে বিনষ্ট হবে সৃষ্টি। রসাতলে যাবে সবকিছু।

মহেশ্বর সবই জেনেছিলেন আগে। তবুও দেবতাদের প্রার্থনায় হেসে অভয় দেন। তারপর সেই পরস্পর সংঘর্ষমুখী অস্ত্রের মাঝখানে দেখা দেন অনলস্তম্ভ রূপে। দুই অস্ত্রই বিলীন হয় সেই অনলস্তম্ভে।

ঘটনার আকস্মিকতায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু হতচকিত। হতদম্ভও। এই বিরাটের সামনে তাঁরা যে অতি নগণ্য এই বোধ তাঁদের বিনত করল। কৌতূহলীও। তাঁরা জানতে চান এই অনলস্তম্ভের আদি এবং অন্ত। তাই আর যুদ্ধ নয়। পারস্পরিক আলোচনায় হংসবাহন ব্রহ্মা চললেন মূর্তির অন্ত সন্ধানে আর বিষ্ণু বরাহরূপে যান মূর্তির উৎস বা মূলের খোঁজে।

বৃথা সে অনুসন্ধান। অথবা আত্মজ্ঞান লাভের সেই অভিযাত্রা। বিষ্ণু বরাহ রূপে পাতালের অধোদেশে গিয়ে সন্ধান পান না সেই অনলস্তম্ভের মূলের। ব্যর্থ, পরিশ্রান্ত বিষ্ণু আবার ফিরে আসেন সেই রণস্থলেই।

ব্রহ্মাও তাঁর হাঁসে চেপে অনেক অনেক উর্ধ্বে উঠেও দেখা পান না সে স্তম্ভশীর্ষের। ব্রহ্মাও ক্লান্ত। তারই মধ্যে দেখেন একটি কেতকী ফুল নেমে আসছে। প্রশ্ন করে জানতে পারেন বহু-বহুদিন আগে ওই স্তম্ভের মধ্য থেকে এই কেতকী অধোগামী। কিন্তু আজও এর আদি দেখতে পায়নি।

দুষ্টুবুদ্ধি চাপে ব্রহ্মার মাথায়। চালাকিতে বাজিমাত করতে চান তিনি। তাই কেতকীকে বলেন, তাকে মিথ্যা সাক্ষী হতে হবে। বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বলতে হবে ব্রহ্মা স্তম্ভের শীর্ষ বা অন্ত দর্শন করেছেন। রাজি হন কেতকী। বলেনও তাই। নিজের ব্যর্থতায় হতাশ বিষ্ণু ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে চান। আর ঠিক তখনই সেই স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হন মহাদেব। রুদ্রমূর্তি তখন তাঁর। বিষ্ণুর সত্যভাষণের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। আর তীব্রস্বরে ভর্ৎসনা করেন ব্রহ্মাকে। তাঁর ভ্রূ থেকে আবির্ভূত হয় ভৈরব। শঙ্করের নির্দেশে ব্রহ্মা যে মুখ দিয়ে অনৃত বাক্য উচ্চারণ করেন সেই পঞ্চম মাথাটি কেটে

নেন। সেদিন থেকে ব্রহ্মা হন চতুরানন।

ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় শান্ত হন আশুতোষ। নিরস্ত করেন ভৈরবকে। ব্রহ্মাকে বলেন, পুজো পাওয়ার লোভে তুমি এই কপটতার আশ্রয় নিয়েছিলে। মিথ্যে বলেছিলে, এরই শাস্তি হিসেবে আজ থেকে বিশ্বে কোথাও তোমার আর আলাদা কোনও পুজো উৎসব হবে না। আন্তরিক অনুতাপে জ্বলে ব্রহ্মা মেনে নেন সে শাস্তি। কাতর ভাবে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

শিব তখন শান্ত। বলেন, দেখ, রাজদণ্ডের ভয় না থাকলে এ জগৎ বিনষ্ট হয়ে যেত। রাজদণ্ডের ভয়েই জগৎ চলে নিয়ম মতে। সেদিন মহাদেব আরও বলেন, অগ্রহায়ণ মাসে আর্দ্রা নক্ষত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা উৎসব পালন করলে তা হবে অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক। শিবপুরাণের বিদ্যেশ্বর সংহিতার এই বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি অনলস্তম্ভ বা লিঙ্গ হিসেবে আবির্ভূত হন অগ্রহায়ণের আর্দ্রা নক্ষত্রে। আর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মিলিত ভাবে তাঁর পূজা অর্চনা করেন মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। ইশান সংহিতায় আছে, ওই তিথির মহানিশায় কোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল শিবলিঙ্গ দেখা গিয়েছিল। আর মহেশ্বর স্বয়ং এই দিনটি শিবরাত্রি হিসেবে পালন করার নির্দেশ দেন। বলেন, এই দিন যিনি তাঁর লিঙ্গ বা প্রতিমূর্তিতে পুজো করবেন তিনি হবেন অশেষ পুণ্যের অধিকারী। যিনি কাউকে বঞ্চনা করেন না, তিনি শিবরাত্রির দিনে সংযত চিত্তে অহোরাত্র পুজো করলে এক বছর নিয়মিত পুজো করার পুণ্যের অধিকারী হন।

শিবরাত্রির উদ্ভব বা প্রচলনের এই হলো ইতিহাস। এটি এমন একটা পূজা-উৎসব যা সারা ভারতের সব জাতি, সব বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে পালন করেন।

শিবরাত্রি একটি সর্বভারতীয় পূজা উৎসব। হিন্দুদের উৎসব-যুক্ত যে ক'টি পূজানুষ্ঠান আছে শিবরাত্রি তার অন্যতম। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিশিজাগরণ এবং রাত্রির চার প্রহরে বিশেষ বিশেষ উপচার এবং মন্ত্রে শিবের আরাধনা এবং একই সঙ্গে রাত জাগার অনুষঙ্গ হিসেবে সারা রাত ধরে নাচ-গান-নাটক ইত্যাদির অনুষ্ঠান।

শিবরাত্রি— এক রাত্রির অনুষ্ঠান। তবে কোথাও কোথাও শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে একাধিক দিনের মেলাও বসে। এর আরেক বৈশিষ্ট্য হলো— ব্রতীরা নিজেরাই চার প্রহরে শিবের ওই পূজা করে থাকেন। আলাদা করে পুরোহিতের প্রয়োজন প্রায় পড়েই না।

শিবরাত্রি কিন্তু দু'ভাবে পালন করা হয়। এক, ওই বিশেষ দিনে পূজার্চনার মধ্য দিয়ে। দুই, ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে। ব্রত আবার দু'রকম ভাবে পালন করা হয়। শিবরাত্রির দিন উপোস করে পূজা ও ব্রতকথা শুনে পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন ও পারণ ভঙ্গ। দ্বিতীয়টি হলো বছরভর ব্রত পালন। এক্ষেত্রে কোনও এক শিবরাত্রিতে ব্রত রেখে পরবর্তী শিবরাত্রিতে তা উদ্‌যাপন করতে হয়। এক্ষেত্রে ওই এক বছর প্রতিমাসে পূজা, উপবাস ও জাগরণ করতে হয়।

গরুড় পুরাণের মতে, এইভাবে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করলে ব্রতীর স্বর্গবাস হয়। শিবরাত্রির মাহাত্ম্য সম্পর্কে পুরাণে বিভিন্ন ব্রতকথা আছে। সেইসব ব্রতকথার সার বক্তব্য, যদি দুর্জনেও, নিজের অজ্ঞাতে সারাদিন উপবাসী থেকে রাত্রে চার প্রহরে শিবের মাথায় জল বেলপাতা দেয় অথবা শিব মন্দিরের প্রদীপ জ্বালায় তাহলে সেও অশেষ পুণ্যের অধিকারী হয়। মৃত্যুর পর তার গতি হয় শিবলোকে। এ সম্পর্কে শিব পুরাণে আছে দুটি কাহিনি। প্রথমটিতে রুরুদ্রুহ নামে এক ব্যাধ কোনও এক শিবরাত্রির দিন বাবা-মা এবং স্ত্রীর আহারের জন্য শিকারে যায়। সারাদিনে একটিও শিকার এবং কোনও খাবার না পেয়ে ওই ব্যাধ দিনের শেষে এক জলাশয়ের কাছে অপেক্ষা করে। পশুরা রাতে ওখানে জলপানের জন্য এলে তাদের হত্যা করবে এই মতলবে সেখানে ঘাপটি মেরে থাকে ব্যাধ।

রাতের প্রথম দিকে আসে এক হরিণী। তাকে মারতে গেলে সে তার বাচ্চাদের কারও কাছে রেখে আসার জন্য একটু সময় চায়। বলে সে ঠিক ফিরে আসবে। হরিণী চলে যায়। অপেক্ষা করতে থাকে রুরুদ্রুহ। এমন সময় ওই হরিণীকে খুঁজতে আসে তার বোন। ব্যাধ তাকে মারতে গেলে সেও একই কথা বলে বিদায় নেয়। ব্যাধ জেগে অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর আসে সেই হরিণীর স্বামী হৃষ্টপুষ্ট এক হরিণ। তাকে মারতে গেলে সেও একই ভাবে একটু সময় চেয়ে বিদায় নেয়।

রাতের চার প্রহরের সময় কথা রাখতে সেই হরিণ এবং দুই হরিণী এসে ব্যাধকে বলে, 'এবার আমাদের হত্যা করো। এদিকে তাদের বাচ্চারাও এসে একই কথা বলে। 'যদি বাবা মা-ই না থাকে তাহলে বেঁচে লাভ কী? তুমি আমাদেরও হত্যা করো'।

ব্যাধ যে গাছে ঘাপটি মেরে ছিল সেটি একটা বেল গাছ আর নীচে ছিল একটি শিবলিঙ্গ। প্রতিবারই হরিণদের মারার জন্য ধনুক-বাণ ঠিক করার সময় নড়াচড়ায় বেলপাতা এবং একটু করে শিশিরের জল পড়ে গাছের তলায় শিবের মাথায়। তাতেই তার উপোস করে চার প্রহরের পুজো হয়ে যায়। তাতেই হয় তার পরম জ্ঞান। সে আর হরিণদের মারে না। শিব এবার দর্শন দিয়ে বলেন, 'তোমার পুজোতে খুশি হয়েছি আমি। বর চাও'। রুরুদ্রুহ লুটিয়ে পড়ে শিবের পায়ে। বলে, 'আমি তো সবই পেলাম'।

রুরুদ্রুহ শিবের বরে পেল রাজার মতো বৈভব। আর পরজন্মে জন্মাল রামের সখা 'গুহ' হিসেবে। অন্তিমে পেল পরম পদ। দ্বিতীয় কাহিনিতে দুরাচারী বেদনিধি শিবরাত্রির রাতে অভুক্ত থেকে শিবের প্রসাদ চুরি করে খাওয়ার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং অন্য পুরাণকথায় ব্যাধ সুন্দর একই ভাবে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে মুক্তিলাভ করে। শিবরাত্রির মূলকথা, এটি সর্বজনের মুক্তির এক সহজ সরল অনুষ্ঠান ও এখানে রয়েছে সকলের সমান অধিকার। ঘটেছে পূজা ও বিনোদনের মেলবন্ধন। ■

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সার— এক কথায় ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ। ধর্ম্মের, ভগবৎ-সাধনার, আত্মানুভূতির বহু পথ ও মত আছে— তাহাদের এক একটি ধরিয়া এক একটি মার্গ, সম্প্রদায়, এমন কি জাতি পর্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদান্ত ও তন্ত্র মার্গ, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান জাতি— ইহারা প্রত্যেকে ঘোষণা করে ও বিশ্বাস করে যে আসল ও পূর্ণ সত্য সেই পাইয়াছে এবং অতিরিক্ত গোঁড়া যাঁহারা তাঁহারা নিজের সত্যকে সত্য বলিয়াই সন্তুষ্ট নহেন অপরের সত্যকে মিথ্যা, অন্তত অর্দ্ধ বা ইতর সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনা ও উপলব্ধির দ্বারা— শুধু চিন্তা জগতে বিচারের ও তর্কসিদ্ধান্তের দ্বারা নয়— প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যাবতীয় ধর্ম্মপথের, অধ্যাত্মসাধনার মূল এক ও অভিন্ন। একই মূল সত্যকে নানা নামে, নানারূপে, নানা রঙে মানুষের প্রতীতি অভিব্যক্ত করিয়াছে। সে মূল সত্য সন্ময়, চিন্ময়, আনন্দময়— তাহা অনন্ত অনির্ব্বচনীয়; স্বরূপে তাহা অরূপ, নির্গুণ নিরাকার, অবাঙ্মানসগোচর— তাহাই আবার রূপের মধ্যে সাকার, সগুণ, সান্ত; তাহা পরম জ্ঞান, পরম শক্তি, পরম প্রেম— আবার তাহাই নেতি নেতি, নির্ব্বিকল্প, কৈবল্য, শূন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মের, অধ্যাত্মের মর্ম্মস্থানে পৌছিয়াছেন, কারণ তিনি তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন ওই মর্ম্মের পথে। শুদ্ধ বৈদান্তিক ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য চলেন জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া— অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা— বিচার বিতর্ক, ধ্যান-ধারণা-সমাধির পথে; তিনি মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিয়া মস্তিষ্কের উপর উঠিয়া যান, তাহার সত্তার চেতনার মুখ্যতঃ হইল এই উর্দ্ধায়ন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওই একই ব্রহ্মোপলব্ধিতে পৌছিয়াছেন ওই রকম বুদ্ধির উর্দ্ধায়নের ফলে ততখানি নয় যতখানি হৃদয়ের মধ্যে, অন্তর্হৃদয়ের মধ্যে— এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে,— গভীর অভিনিবেশের, অবগাহনের ফলে; অন্তরাত্মার অতলে তিনি এতখানি চলিয়া গিয়েছেন যে পরিশেষে দেখি তিনি সেই একই উর্দ্ধভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আবার হৃদয়পথে তিনি অতখানি গভীরে চলিয়া গিয়েছিলেন বলিয়াই সাধারণ বৈষ্ণবসুলভ ভাববিলাসিতা, আবেগ আতিশয্য অতিক্রম করিয়া তিনি একটা ভাবঘন স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। আর তান্ত্রিকের প্রাণশক্তি সাধনার অবান্তর উপাঙ্গ সব পরিহার করিয়া, উহার মূলতত্ত্ব যে প্রাণকে মায়ের চিন্ময় শক্তিতে ভরিয়া তোলা তাহা সংসিদ্ধ তিনি করিয়াছিলেন সে প্রাণকে অন্তরাত্মার তীব্র আস্পৃহা-বহ্নিতে সমিদ্ধ ও জ্যোতিস্ময় করিয়া। ফলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার বৈশিষ্ট্যই হইল, এই অন্তঃপুরুষের একাগ্র একান্ত তীব্র আস্পৃহা, তাহার নৈসর্গিক অযত্ন-সুলভ বিবেক বৈরাগ্য পরানুরক্তি ও সমাহিতি অন্তশ্চেতনার সেই সব সহজ আদিশক্তি যাহাদের সহায়ে পথের জটিলতা কুটিলতা দীর্ঘতা হইয়া উঠে সরল ঋজু হ্রস্ব। এক একটি সাধন ধারা, স্বাভাবিক গতিতে চলিলে যাহাতে প্রয়োজন হয়, সমস্ত জীবন, এমন কি একাধিক জীবন এবং দারুণ কৃচ্ছ্র-প্রয়াসপূর্ণ জীবন, তাহাদের প্রত্যেকটি তিনি আপনার অন্তঃপুরুষের প্রদীপ্ত চেতনার মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া ধরিয়াছেন, হেলায় যেন তাহার সিদ্ধি আনিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানে ছিল স্বয়ংপ্রকাশ অব্যর্থতা, সহজ নিশ্চয়তা, তাঁহার ভক্তিতে প্রীতিতে অকুণ্ঠ আত্মদানের নিবিড়তা ও সারল্য— কিন্তু তাঁহার শক্তি আরও চমৎকার, অনির্ব্বচনীয়। কারণ, এই শক্তির বাহ্য আড়ম্বর নাই, জোর-জবরদস্তি নাই, নাই উগ্রতা প্রচণ্ডতা— এত স্বাভাবিক, এত কমনীয়, অথচ এত তেজোময় সামর্থ্যময়। সে ব্রাহ্মণ্যশক্তির কিঞ্চিৎমাত্র বিবেকানন্দের বিপুল ক্ষাত্রবিক্রমে শরীরী হইয়া দেখা দিয়াছিল। কারণ সে শক্তি অন্তঃপুরুষের সহজাত অঙ্গভঙ্গ, চেতনার নিজস্ব ছন্দ, সত্তার আপন প্রভা বিকীরণ।

২

জগতে যুগে যুগে যে মহাপুরুষেরা অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা এক একটি সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক ঘটনা-মাত্র নয়। স্থূলপ্রকৃতির মধ্যে একটা ক্রমবিবর্ত্তন চলিয়াছে, তাহা আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি— সেই রকম আধ্যাত্মিক বা অন্তশ্চেতনার ক্ষেত্রেও সৃষ্টির মধ্যে চলিয়াছে এক ক্রমবিবর্ত্তন। অবতার, বিভূতি— ইঁহারা এই ক্রমবিবর্ত্তনের বিভিন্ন ও বিবিধ সোপান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এক এক জন উপর হইতে এক একটি বিশেষ চেতনা ঐহিকের মধ্যে নামাইয়া ধরেন, মানব-চেতনার পক্ষে তাহাকে আয়ত্ত করা বা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য করিয়া তোলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে এক যুগাবতার ছিলেন। তিনি নিজের মধ্যে মূর্ত্ত করাইয়াছেন 'অধিমানস' চেতনা— মনের বুদ্ধির অব্যবহিত উপরে যে বিশ্বগত সার্ব্বভৌমচেতনা— যাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি গীতার বিশ্বরূপদর্শনে তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। বুদ্ধের অবদান 'বোধি' উর্দ্ধতর, সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ বুদ্ধি; এই বৃত্তির ভিতর দিয়া, ইহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি অধ্যাত্ম-চেতনাকে মানবচেতনার গোচর করিয়া ধরিয়াছেন। শঙ্করের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা আরও এক ধাপ কাছে আসিয়াছে— কারণ, শঙ্কর হইলেন তর্কবুদ্ধির মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার অবতরণ, অধ্যাত্মচেতনার মধ্যে তর্ক বুদ্ধির উন্নয়ন। খ্রিস্ট অধ্যাত্ম- চেতনাকে মানুষের আরও ঘরের কাছে আনিয়া, মানুষের আপনার এবং অন্তরঙ্গ করিয়া দিয়াছেন— অধ্যাত্ম-চেতনাকে হৃদয়ে নামাইয়া আনিয়া, ফুটাইয়া ধরিয়া, উপলব্ধি করিয়া এবং উপলব্ধি করাইয়া।

মহম্মদের মধ্যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল অধ্যাত্মচেতনাকে কেবল মনে নয়, হৃদয়ে না— প্রাণের কর্ম্মৈষণার মধ্যে, জীবনীশক্তির মধ্যে আরও বাস্তব, আরও সজীব ও মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে। চৈতন্যের মধ্যে সংসিদ্ধ হইয়াছিল এই প্রাণেরই আর এক অংশের দীক্ষা বা অধ্যাত্ম-উপনয়ন— যাহা হইল কামনার, আসঙ্গ-লিপ্সার, আবেগের ক্ষেত্র।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, এই সকল মহাপুরুষেরা যে যে বৃত্তি ধরিয়া অধ্যাত্ম-চেতনা উপলব্ধি করিয়াছেন বা যে যে বৃত্তিকে অধ্যাত্ম-চেতনার প্রভাব রূপান্তরিত করিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে ব্যক্তিগত ভাবে আর কেহ সে বিশেষ সাধনা করে নাই বা তাহাকে সিদ্ধি পায় নাই; আমরা বলিতেছি ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত চেতনার কথা--- মানুষের মধ্যে, একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীগত সিদ্ধির পথ ও সম্ভাবনা ইহারাই আপন আপন ভাবে তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। আগে যেখানে গভীর জঙ্গলে পায়ে-চলা পথের দাগ ছিল কি না ছিল, হয়ত ছিল শুধু দূরে দূরে দুই একটি বিচ্ছিন্ন পদচিহ্ন মাত্র— সেখানে এই সকল অবতার বিভূতিগণ পাকা সড়ক যেন বাঁধাইয়া দিয়াছেন, যাহার ইচ্ছা সে সহজেই ও পথে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে।

৩

মন প্রাণ শুধু নয়, স্থূল চেতনা দিয়া ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করা, দেহের মধ্যে দেহকোষেরই মর্ম্মে দেহগত অন্তঃপুরুষের জাগরণ— ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে যেন এই পার্থিব লোকেরই আত্মা সচেতন হইতে চাহিয়াছে। আমি বলিয়াছি রামকৃষ্ণ হইলেন মূলত হৃদ্‌পুরুষের দিব্য-চেতনা--- এই হৃদ্‌পুরুষই ব্যক্ত-আধারের, দেহপ্রাণমনের নিগূঢ় অধ্যক্ষ, ইহারই মধ্যে আসিয়া আধারের সকল নাড়ী মিলিয়াছে। হৃদপুরুষেরই সম্যক জাগরণে, মনোময় প্রাণময় এমনকী অন্নময় পুরুষ জাগ্রত হয়— ভগবৎমুখী হয়, চায় আত্মার সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য। মানুষের এই অন্তঃপুরুষ চিরদিনই ভগবানকে চাহিয়া আসিয়াছে— তাহার স্বাভাবিক গতিই হইল অধ্যাত্মের দিকে; মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে যে একটা ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তন আছে, তাহার মূল এইখানে। অন্তরাত্মার চেতনা যতখানি জাগ্রতের মধ্যে প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেই জাগ্রতও ততখানি ভগবৎমুখী হয়, ভগবৎ সত্তায় গড়িয়া উঠে। অন্তরের চেতনা ধরিয়া, অন্তরের ঊর্দ্ধতর লোকে স্থিতিতে উঠিয়া যাওয়া মানবচেতনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ অতীতে বেশিরভাগ সাধনমার্গের লক্ষ্য এই ধরনের ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে অধ্যাত্মসাধনার মোড়টি যেন ঘুরিয়া গিয়াছে। অতীতের সকল সাধনার ধারা তিনি নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছেন, তাহাদের সারটী আত্মসাৎ করিয়াছেন, এইভাবে চেতনাকে, আধারকে বিশুদ্ধ করিয়া, শাণিত করিয়া, ভরাট করিয়া তাহাকে প্রযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন এক নূতন লক্ষ্যের দিকে। সে লক্ষ্য আর কিছু নয়— জাগ্রত ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করা, আধিভৌতিক অধ্যাত্মের রাজ্য স্থাপন করা, এই জড়-আয়তনকে, এই নিরেট নিথর অজ্ঞানকে পরম জ্যোতির আনন্দের স্পর্শে সঞ্জীবিত, রূপান্তরিত করিয়া তোলা। অবশ্য এই লক্ষ্যটি ঠিক এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য চেতনায় যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সজ্ঞানে এই উদ্দেশ্যেই যে তিনি কাজ করিতেছিলেন, এমন হয়ত বলা চলে না। কিন্তু এই লক্ষ্যের ভিত্তি তিনি গড়িয়া দিয়াছেন, এই লক্ষ্যের দিকে গতির সূচনাও তিনি করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্বের দিক হইতে তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের উপর সমান— বা অধিকতর--- জোর দিয়াছেন। তাই কামিনীকাঞ্চন লইয়া, ব্যাধি লইয়া তাঁহাকে বিশেষ দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ভোগ করিতে হইয়াছে। নতুবা আশ্চর্য বোধ হয় না কি— অনেক সিদ্ধপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা অল্পতর শক্তি লইয়া এতখানি দ্বন্দ্বসংঘর্ষের হাত এড়াইয়া গিয়াছেন কি রকমে? রহস্যের মীমাংসা এই হইতে পারে— নিম্নতর প্রাণের মধ্যে, স্থূল দেহেরও মধ্যে অন্তরাত্মার জ্যোতি ও আস্পৃহা শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনাকে ধরিয়া নামিয়া আসিতে চাহিয়াছে, যাহাতে এই নিম্নতর ও নিম্নতম অঙ্গেরও অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠে, ইহারাও চায় ভগবানকে, অধ্যাত্ম-চেতনাকে। অবশ্য এই ধারার শেষ বা পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ নহেন, তাঁহার কাজ শেষ করা নয়, শুরু করা— তিনি পরিণতি নহেন তিনি হইলেন নবজন্ম।

এই দিক হইতে দেখিলে তাই আমরা বলিতে পারি, পার্থিব চেতনার জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ সদ্যোজাত চেতনা--- ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ। ভগবত চেতনা ধীর ধীরে নামিয়া আসিয়াছে তাহার লোকাতীত স্থিতি হইতে এই লৌকিকের দিকে— সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলতরের মধ্য আপনাকে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে চাহিয়াছে; কিন্তু এ যাবৎ স্থূলতম স্থূলকে তাহা স্পর্শ করে নাই— আর এই জন্যই সূক্ষ্মতর জগতেও সাধারণ ভাবে অধ্যাত্মের অবিসম্বাদী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দৈবদুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন যাহার ভিতর দিয়া দ্যুলোক আসিয়া ভূলোককে স্পর্শ করিয়াছে। স্বর্গ পৃথিবীতে আসে নাই, কারণ পৃথিবী স্বর্গকে চায় নাই— আত্মা দেহকে অমৃতময় করিয়া তোলে নাই, কারণ দেহ নিজে আত্মাকে চিনে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ হইলেন স্বর্গের সেই যাদুস্পর্শ, আত্মার সেই স্ফুলিঙ্গ যাহা পার্থিব আয়তনের অন্তর্যামীকে জাগ্রত করিয়াছে, শরীর আত্মাকে, অন্নময় পুরুষকে সচেতন করিয়া ঊর্দ্ধমুখী করিয়াছে।

আবার বলি, রামকৃষ্ণের নিজের লক্ষ্য এই রকম ছিল অথবা সজ্ঞানে এই আদর্শের সাধনা তিনি করিয়াছেন তাহা হয় ত নয়। আমি বলিতেছি তাঁহার সাধনার স্বাভাবিক পরিণতির কথা, বিশ্ব-প্রকৃতি বা ঊর্দ্ধতর প্রচ্ছন্ন চেতনা তাঁহাকে কোন সার্থকতার যন্ত্র করিয়াছে সেই রহস্য।

বহিরায়তন অবধি, একান্ত স্থূল অঙ্গ ও ক্ষেত্র পর্যন্ত অন্তঃপুরুষের ভাগবত চেতনার প্রভাব ও কর্ত্তৃত্ব বিস্তার— নবযুগে অধ্যাত্মের এই অভিযান ও দিগ্‌বিজয় মূর্ত্ত হইয়াছে বিবেকানন্দের মধ্যে। বাহির অপেক্ষাও বাহির, স্থূল হইতেও স্থূল হইয়া পড়িয়াছে মানুষের চেতনা যে দেশে, পাশ্চাত্যেরও পাশ্চাত্য সেই আধুনিক আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের এই তেজঃ-স্ফুলিঙ্গটি কেন ও কি উদ্দেশ্যে যে আসিয়া পড়িল, তাহার অর্থ আমরা বুঝি এই রকমে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে একটা যুগান্তর, অধ্যাত্ম ক্রমবিবর্ত্তনে মানব চেতনার একটা নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত।

(শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের বিচিত্রা থেকে গৃহীত)

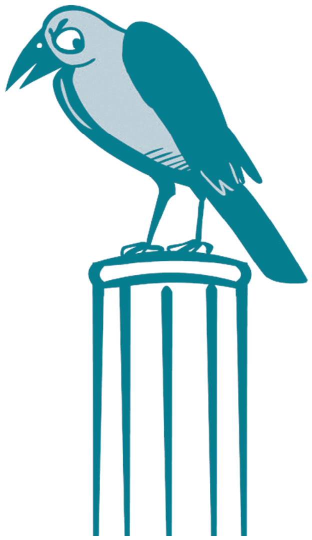

জয় কিষান জয় জীবন

ভারত সরকারের আগামী বছরের বার্ষিক বাজেট পেশ হলো, স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত নতুন ভারত নির্মাণের দিশায়। বাজেট বক্তৃতা শেষ হলো, স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করে স্মরণ করা হলো যে, নতুন ভারত বেরিয়ে আসবে খেটে খাওয়া মানুষের ঘর থেকে। সেই জন্যেই এবারের বাজেটে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে উন্নয়নের ভিত্তি তিনটি মূল বিষয়ের ওপর— কৃষি, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্য। বাজেটে যে সাধের কথা বলা হয়েছে, তা হয়তো সর্বাংশে সাধ্য নাও হতে পারে, কিন্তু নির্দেশিত ঠিকানায় চললে, সেটা যে ক্রমে পূরণ হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন কিন্তু বিরল নয়। সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে যে লক্ষ্য ও পথ ঠিক করা ও তারপরে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলা, এই কথার সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক মহিমায়, বিরোধী রাজনীতিতে একটি কথাই স্পষ্ট যে, ‘যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা’। শাসকপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ এই দুইয়ের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই যে নির্বাচিত সংসদ সেকথা কারোরই মনে থাকে না। বিরোধীপক্ষের একটিই কথা— মানছি না মানব না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়— কী মানছ না, কী মানবে না, তখন কিন্তু অনেক ধানাইপানাই হয়। যে কথাটা স্পষ্ট হয় তার অর্থ জানি না। নির্বাচন কমিশনার শেসণ যখন ভোটজালিয়াতি রুখতে ভোটারকার্ড প্রবর্তন করলেন, তখন মহা মহানেতারা তাঁকে পাগল, ছাগল বলতে ছাড়লেন না। কিন্তু সেই ভোটারকার্ড আজ নির্বাচনের অবিভাজ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই ট্র্যাডিশন সমানে চলে আসছে।

তাই বোধ হয়, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট প্রকাশ হওয়ার পর বিশ্ববঙ্গ ব্র্যান্ডের মহাবিজ্ঞরা সব শেয়ালের এক রা-র সুরে বলে উঠলেন— সব ঝুট হ্যায় ফ্লপ শো। সেকথা অবশ্য সত্যি, কেননা তার আগের দিনই, রাজ্য বাজেটের গ্র্যান্ড শোতে ভ্রাতাশ্রী, মাতাশ্রী, রূপশ্রী মহাপ্রকল্পের কথা ঘোষিত হয়েছে। রাজা ধন বিতরণ করেন, কোথায়? না, অন্তঃপুরে। গণতান্ত্রিক রাজা কোষাগার মুক্ত করেন, কোথায়? না, ভোটারের অন্তঃপুরে। ধন বিতরণ অপেক্ষা ধন উৎপাদন ও তার সুষম বণ্টনই যে দরকারের কাজ সেকথা মনে রাখাটা অবশ্যই কোনও কাজের কথা নয়।

সরকারি প্রস্তাবনার মধ্যে অনেক ফাঁকফোকর, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতেই পারে, এবং সেগুলি অবশ্যই আলোচনা তথা সমালোচনার যোগ্য যাতে একটি সুসিদ্ধান্তে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সেটা মোটেই গ্র্যান্ডশো বা ফ্লপ শো বলাতে মহীয়ান হয়ে ওঠে না। কৃষি, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্যই যে উন্নয়নের মূল ভিত্তি এবং মোদী সরকার সেই বিষয়ে দিকনির্দেশ করে যে প্রকল্পের সূচনা করেছেন তা অবশ্যই সঠিক পথের নির্দেশক সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

একদা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরে পরেই একটি স্লোগান তুলেছিলেন— জয় জওয়ান জয় কিষান। কেননা তিনি বুঝেছিলেন, ভারতের দুটি প্রধান সমস্যা, প্রতিরক্ষা ও খাদ্যাভাব। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী স্বস্বীকৃত বিট্রিশার নেহরুসাহেব কিন্তু এই দুটি ব্যাপারেই নির্বোধ অবহেলার জনক ছিলেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমেজে শিল্পোন্নত ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি চৈতন্য হারিয়ে ছিলেন যে, দেশের উন্নতির প্রাথমিক শর্ত জনগণের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ভিত্তিকে মজবুত করা। আর যে প্রতিরক্ষার স্ট্র্যাটেজিক প্রস্তুতির অভাবে ভারত যুগে যুগে বৈদেশিক আক্রমণে পর্যুদস্ত, বামপন্থী মোহের আচ্ছন্নতায়, নেহরুসাহেব পঞ্চশীল মন্ত্রের ঘোরে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির চূড়ান্ত অবহেলায় চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণের শিকার হন।

সেই নির্বোধ অবিমৃশ্যকারিতার শোচনীয় অভিজ্ঞতাতেই বিচক্ষণ নেতা লালবাহাদুর প্রধানমন্ত্রী হয়েই নজর দিলেন, খাদ্যোৎপাদন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর অকালবিয়োগ ঘটায় তিনি তাঁর প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পাননি। তবে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই দুটি বিষয়ে জোর দেওয়ার পরিণতিতে খাদ্যে ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হওয়ার ফলেই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হন।

সবুজ বিপ্লবে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়ার পর একযুগ অতিক্রান্ত এবং ভারতের জনসংখ্যা এখন একশো কোটির উপরে হওয়ায়, আজ কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে দেশ নবপর্যায়ে একটি কৃষিবিপ্লবের অপেক্ষায়। ভোটের প্রয়োজনে কৃষকদের কিন্তু সুবিধাদানের প্রয়াস সব রাজনৈতিক দলগুলিই এপর্যন্ত করে এসেছে। যেমন ভোটের প্রয়োজনে উদার দাক্ষিণ্য পূর্বতন ইউপিএ সরকার বিপুল পরিমাণ কৃষিঋণ মকুব করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কোনও কোনও রাজ্যে এনডিএ সরকারও একই বন্ধ্যানীতি অনুসরণ করেছে— হয় ভোটের প্রতিশ্রুতি হিসেবে, কিংবা ভোটপ্রাপ্তির পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু তাতে যে কৃষির উন্নতির কোনও কথা নেই তা সুস্পষ্ট। চাষের নাম করে কৃষিঋণ নিয়ে সেটি আত্মসাৎ করা তথা অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কাজে লাগানোর ঘটনার পরিমাণ কম নয়। তারপরে সরকারি ঋণ মকুবের অবদানের জনক চিদম্বরমজি এখন কিন্তু কৃষিবিষয়ের আলোচনায় খুবই সরব।

মাঝে আমাদের দেশে মহা মহা পণ্ডিতরা বিজ্ঞতার নিদর্শনে অঙ্ক কষে সরব হয়েছিলেন। কৃষিতে সার কিছু করার নেই, এখন শিল্পোৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে চাকরি

সৃষ্টির জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কৃষিজাত ডাল ও তেল আমদানির জন্য আমাদের বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রার অপচয় হয়। এই দুটি পণ্য আমাদের কৃষিতে অজানা নয়। সুতরাং যথাযথ পরিকল্পিত ভাবে এই দুটি কৃষিজ দ্রব্যের চাষ করে অনায়াসেই আমরা এই দুটি পণ্যে আমদানিকারক না হয়ে অবশ্যই রপ্তানিকারক হতে পারি। তাছাড়া একাধিক কৃষিজাত দ্রব্য, সবজি, ফল ও তার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ করে রপ্তানির মতো বেশ কিছু দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ, মাংস ইত্যাদি যেগুলির রপ্তানি আমাদের মোটেই অজানা নয়।

সুতরাং শুধু স্বনির্ভরতাই নয়, বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের উদ্দেশ্যে রপ্তানির জন্যও কৃষি তথা কৃষকের সমৃদ্ধি এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। সেটা কিন্তু কৃষককে ডোলদান, কৃষিঋণ মকুব দিয়ে মোটেই সম্ভব নয়। আমরা আমাদের কৈশোরে যে মান্ধাতার আমলের কৃষিব্যবস্থা দেখে এসেছি, তা থেকে দেশ অনেক এগিয়ে এসেছে, কিন্তু গো-শকটের গতিতে। এখন দরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নতিতে আধুনিক পদ্ধতি ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

এই মূল বিষয়টি সম্বন্ধে কিন্তু কোনও সুচিন্তক ব্যক্তির কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। এই ব্যাপারে অযথা সরকারের বিরোধিতা না করে, মূল চিন্তাটিকে ঠিক রেখে সকলের গঠনমূলক ভূমিকায় অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। চাষিদের আত্মহত্যা, কংগ্রেস রাজত্বেও কিছু কম নয়, কিন্তু সে ব্যাপারে পারস্পরিক দোষারোপ না করে, চাষি আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে পঞ্চায়েত স্তরে কীভাবে চাষিকে আশ্বস্ত করে সাহায্য করা যায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু বা চাষির আত্মহত্যা রোধের জন্য পঞ্চায়েত প্রশাসনকে দায়ী করে ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। গ্রামীণ ন্যূনতম রোজগার যোজনা চাষিকে সাহায্য করার পরিবর্তে একটি লুটপাটের সুচারু ব্যবস্থা যেমন গড়ে তুলেছে তেমনি কৃষিশ্রমিকের অভাব তীব্রতর করেছে। কোনও কাজ না করে যদি খাতায় কলমে ভাগাভাগি করে টাকার আমদানি হতে পারে তাহলে লোকে খাটতে যাবে কোন দুঃখে।

এবারের বাজেটে সার্বিকভাবে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি, কৃষিজ শিল্প এবং কৃষিপণ্যের সুবিহিত বাজারিকরণ তথা কৃষিদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও চাষির হাতে অর্থের জোগান নিশ্চিত করার জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন সেটি গ্রামস্তরে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করার অপেক্ষায়। এই ভাবনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে যদি ফাঁক থেকে যায় তাহলে কিন্তু সবই কথার কথা থেকে যেতে বাধ্য। আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা হলো রাজনীতির আবর্তে সব ভালো উদ্দেশ্যই মাঠে মারা যায়।

স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও আমাদের দেশ কিন্তু এখনও গ্রামপ্রধান তথা কৃষিভিত্তিক রয়ে গেছে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নে যদি গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র কর্মোদ্যোগে স্বয়ম্ভর করে তোলা যায় তাহলে গ্রাম থেকে শহরে ভিড় জমানোর চেষ্টা কমতে বাধ্য। তবে গ্রামকে সর্বদিক দিয়ে আধুনিক জীবনযাত্রায় আনার জন্য তো বটেই, এমনকী দেশের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য।

সেই শিক্ষাকে সর্বতোমুখী করার জন্য যে উদ্যোগ বাজেট প্রস্তাবে রাখা হয়েছে সেটি অবশ্যই অত্যন্ত মূল্যবান। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় খালি পেটে যেমন ধর্ম হয় না, তেমনি স্বাস্থ্য ছাড়া শিক্ষা হয় না। গণস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এবারে যে ইন্সিওরেন্সের প্রস্তাব করা হয়েছে, তাকে অনেকেই অলীক, অবাস্তবরূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেও, এই সূত্রপাত অনেক বাধা বিঘ্ন পার হয়ে যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে একটা বিরাট সাফল্যের সূচক হবে। এই ব্যাপারে অনেকে হাতে কলমে কাজ করেছেন, সুতরাং ধীরে ধীরে এটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এর সঙ্গে যদি সমস্ত গণসুরক্ষা প্রকল্পের সমন্বয়ে একটি ইন্সিওরেন্স- ভিত্তিক গণপেনশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়, তাহলে জনকল্যাণের নামে অর্থ অপচয়ের পরিবর্তে ব্যক্তিজীবনের স্বাস্থ্য তথা জীবনধারণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে পারে। তাই নতুন স্লোগান— জয় কিষান, জয় জওয়ান।

কিন্তু তার গুরুত্বের দিকে দৃকপাত না করে মহাবিজ্ঞ সাংবাদিক ও রাজনীতিকরা তাকে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো বলে চিৎকারে সরব। ইলেকশন ম্যানিফেস্টো হলেও তার মধ্যে যে দেশ গঠনের ইঙ্গিত আছে তা বিনাপয়সায় টিভি ল্যাপটপ প্রদান ও ডোলদানের থেকে ভালো নয় কি। ■

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ

জানকী তীর্থম্

আয়ুর্বেদিক ঔষধের দোকান

নেতাজী সুভাষপল্লী, গাজোল, মালদা

প্রো ঃ স্বপন চক্রবর্তী

কথা - ৯৫৯৩৮৮৬৬১২

ধূলিকণা

সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়া।

প্রোঃ- সীমা চক্রবর্তী

স্বপন চক্রবর্তী

সকল প্রকার রোগের অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক

সময়- সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা।

মোঃ ৯৪৩৪৮১৯৭৬০

প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ ঔষধ বিক্রেতা। | নেতাজী সুভাষ পল্লী, গাজোল, মালদা।

চা-কফির গুণাগুণ

সত্যানন্দ গুহ

চা খান না এমন ব্যক্তি বিরল। দুধ-চিনি-চা, লেবু-চিনি-চা, লেবু-চা অথবা শুধু লিকার-চা— অধিকাংশ মানুষ কোনও না কোনও ভাবে চা পান করেন। যাঁরা খান না তাঁদেরও যুক্তি আছে।

চা কোনও পুষ্টিকর পানীয় নয়। একটা অভ্যাস মাত্র। এক কাপ চায়ে ৭৯ ক্যালরি পাওয়া যায়। দিনে দু-এক কাপ চা খেলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু একবার খাওয়া অভ্যাস করলে যখন তখন, যত্র তত্র খাওয়া হয়ে যায়। কারও বাড়ি গেলেই চা নয় কফি— যেন আপ্যায়নের অঙ্গ হয়ে গেছে। সভা সমিতি, অনুষ্ঠান, বিবাহ, শ্রাদ্ধে তো কথাই নেই।

উপাদান :

চায়ের মধ্যে থাকে ক্যাফিন, ট্যানিক অ্যাসিড, প্রেটিন, ফ্যাট, কার্বো হাইড্রেট, থিওফাইলিন, মিথাইল, জ্যানাথিল, পলিফেনল, উদ্বায়ী তেল, ভিটামিন এ, সি, পি, বি$_{১}$, বি$_{২}$, থিওব্রোমিন।

উপকারিতা :

(১) চায়ের মূল উপাদান ক্যাফিন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে। ফলে স্নায়ুর ব্যথায়, অবসাদেও রক্ত চলাচলে সাহায্য করে।

(২) হার্টব্রেন, লাংস ও নার্ভ সাময়িকভাবে চাঙ্গা হয়।

(৩) অ্যাসিড বেশি পরিমাণে ক্ষরিত হয় বলে খিদে বাড়ে।

(৪) কিডনি বেশি সক্রিয় হয় বলে প্রস্রাব বেশি হয়। ফলে দেহ শোধিত হয়।

(৫) ফুসফুসের রক্তনালী ও ক্লোমনালী (ব্রনকাস) প্রসারিত হয় বলে চা পান করলে শ্বাসকষ্টের উপশম হয়।

(৬) থ্রমবোসিসে উপকার হয়, কারণ ভিটামিন পি রক্তজালকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে।

(৭) ঝিমুনি ও দুর্বল ভাব কমায়।

(৮) দ্রুত চিন্তার উন্মেষ ঘটায়।

মনে রাখতে হবে :

(১) লেবু-চা লিকার-চা থেকে ভালো। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড চায়ের ট্যানিন থিতয়ে ফেলে।

(২) সব থেকে ভালো দুধ চিনি মিশিয়ে চা খাওয়া। পুষ্টিমূল্য বেশি। ডায়াবেটিস রোগীদের চিনি বাদ দিয়ে খেতে হবে।

(৩) প্লাসটিক গ্লাস বা কাপে চা খাওয়া নিষেধ, বিষক্রিয়া হয়।

(৪) চীনামাটির কাপে, মাটির ভাঁড়ে চা পান করতে হবে, কাঁচের গ্লাসও চলতে পারে।

(৫) চায়ের ক্যাফিন বিষ নষ্ট করে দুধ। দু'কাপ চায়ের বিষ অন্তত আধসের দুধে নষ্ট হয়।

অপকারিতা :

(১) চা বেশি পান করলে রক্তে ক্যাফিনের মাত্রা বেড়ে যায়। অস্থিরতা বাড়ে, ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

(২) অহেতুক দুশ্চিন্তা, ভীতিভাব, উত্তেজনা, স্নায়ুবিকার বেড়ে যায়।

(৩) বেশি পান করলে হাত-পা কাঁপতে পারে, বমিভাব হতে পারে। পাকস্থলীর শ্লেষ্মাপর্দায় ঘা হতে পারে।

(৪) রক্তচাপ বাড়তে পারে। কোলেস্টেরল ও সুগার বাড়তে পারে। মেজাজ খিটখিটে হতে পারে।

(৫) অতিরিক্ত মুত্রত্যাগের জন্য প্রয়োজনীয় লবণ বের হয়ে যেতে পারে।

(৬) ক্যাফিন বেশি হলে অন্তঃসত্ত্বাদের ভ্রূণের ক্ষতি করে। সময়ের পূর্বে প্রসব বা গর্ভপাত হতে পারে।

(৭) চায়ের চেয়ে কফি বেশি ক্ষতিকর। কফি দ্রুত কাজ করে এবং শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়। হার্টের ক্ষতি করে।

(৮) লিকার চায়ে ক্যাফিন ও ট্যানিনের মাত্রা বেড়ে যায়, যা লিভার ও পাকস্থলীর ক্ষতি করে।

(৯) পাকস্থলীর আলসার, এলার্জি, চর্মরোগ, হার্টের রোগ, ডায়াবেটিস, রক্তচাপ থাকলে চা পান ক্ষতিকর।

(১০) ডাঃ জর্জ অগাস্টিনের মতে, চায়ের ক্যাফিন ও ট্যানিন পাকস্থলীর অ্যাসিড ও পেপসিন নামক উৎসেচক নিঃসরণ করে বলে পেপটিক আলসার রোগীদের ক্ষতি করে। লিভারের কোষও নষ্ট করে।

(১১) ট্যানিন কোষ্ঠবদ্ধতার সৃষ্টি করে।

(১২) চা ও কফি পান ক্রমে নেশা হয়ে দাঁড়ায়।

কয়েকটি মন্তব্য :

(১) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়— 'চা পান আর বিষপান সমান।'

(২) ডাঃ জে ব্যাটিটিউক— 'মদ ও চা সমান ক্ষতিকর'।

চায়ে চিনি দিলে ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। চর্মরোগ, রক্তাল্পতা, বহুমূত্র, গ্যাসট্রিক আলসার ও নানারোগে ক্ষতি করে। চিনির বদলে গুড় খাওয়া ভালো।

(লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসক)

সবুজে ডুবে থাকা এক প্রকৃতিপ্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন গাছেরা স্পর্শ চেনে। ডাকলে সাড়া দেয়। গাছ কাটলে বা গাছের গায়ে পেরেক ঠুকলে আর্তনাদ করে। কিন্তু আমরা সেই আর্তনাদ শুনতে পাই না। শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার অহঙ্কারে প্রকৃতিকে বশে রাখতে গিয়ে আমরা নিজেদেরই ধ্বংস করতে থাকি।

ভাগ্য ভালো, সবাই এরকম নন। গাছ কাটাও যে হত্যা, সেটা মানেন। তিনি কেরলের ডি. রবীন্দ্রন। তাঁর স্পর্শ চেনে গাছ। শিশুর মতো দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরার সাধ্য থাকলে তাঁর বাগানের অসংখ্য গাছ হয়তো তাই করত। ছেলে মাধ্যমিকে স্টার পেলে গর্বিত বাবা যেভাবে প্রতিবেশীকে খবরটা দেন, ঠিক সেইভাবেই রবীন্দ্রন তাঁর বাগানের কথা বলেন। দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম বনসাই বাগানটি তাঁর তৈরি। সেখানে রয়েছে ৪০০০ বনসাই চারা। প্রায় হাজার খানেক

বনসাই গাছ। এটা তার গর্ব। না, তাঁর গর্ব কাউকে আঘাত করে না। বরং এক আশ্চর্য প্রেরণায় ভরে যায় মন।

জীবন শুরু করেছিলেন আইনজীবী হিসেবে। ভালোই চলছিল। ১৯৭০ সালে স্রেফ শখের খাতিরে বাগান করা শুরু। কিন্তু জ্ঞান হওয়া ইস্তক গাছপালা যাঁর এত প্রিয় বাগানচর্চা তাঁর কাছে শুধু শখ হয়ে বেশিদিন থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে ওই বাগানই হয়ে উঠল তাঁর পৃথিবী।

এই সময় তিনি জাপানের বনসাই আর্টের কথা প্রথম শোনেন। বড় গাছের ছোট সংস্করণকে বনসাই বলে। হরলিক্সের বোতলে, প্লাস্টিকের মগে— এমনকী চায়ের কাপেও বনসাই তৈরি করা যায়। বড়োকে ছোট করে নিজের কাছে রাখা একটা বিশেষ ধরনের মানসিকতা। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা তাকে নেশার মতো পেয়ে বসল। ভারতবর্ষে যত ধরনের গাছ পাওয়া যায় প্রায় সবাইকে নিয়েই তাঁর সংসার। গাছের আকার কত বিচিত্রই যে হতে পারে যেটা তার বাগানে গেলে বোঝা যায়।

'প্রথম বনসাই আমি তৈরি করেছিলাম বটগাছ থেকে। তখন এই শিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। মোটামুটি নিজের যা মনে রয়েছে তাই করে গেছি। রবীন্দ্রনের স্মৃতিচারণে উঠে আসে তাঁর বাগানচর্চার প্রথম দিকের নানা কথা। শুরুর চার বছর পর তিনি একটি বই কেনেন। বনসাই মিনিয়েচার পটেট ট্রিজ। লেখক জাপানের কিউওজো মুরাতা। এই বই-ই তাকে বনসাই শিল্পের অন্দরমহলের সন্ধান দিল।

ইতিমধ্যে তিনি স্থানীয় হর্টিকালচার শোগুলিতে অংশ নেওয়া শুরু করেছেন। অল্পবিস্তর প্রশংসাও জুটছে। এই সময় পর্যন্ত বাড়ির বারান্দায় এবং ছাদেই সীমাবদ্ধ ছিল রবীন্দ্রনের গবেষণা। ১৯৯০ সালে তিনি বাগান করার সিদ্ধান্ত নেন। বড় মাপের সাফল্যের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯৯৩ সালে ত্রিবান্দমে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। রবীন্দ্রনের তৈরি ৭৫টি বনসাই সেখানে দেখানো হয়। 'ত্রিবান্দমের সেই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রন প্রথম পুরস্কার পান। এরপর আর তাকে ফিরে তাকাতে হয়নি।

'এই সময় পর্যন্ত আমাকে আপনি স্বশিক্ষিত বলতে পারেন। আমার কাজ যখন মানুষের ভালো লাগতে শুরু করল তখন সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে আরও বড়ো ধরনের গবেষণা করতে হবে। ১৯৯৪ সালে জাপানের সুসুমু নাকামুরার ওয়ার্কশপে যোগ দিই। ওটাই প্রথম আমার হাতেকলমে প্রশিক্ষণ। তবে আমি আরও শিখতে চাইছিলাম। এরপর ভারতে যতগুলো ওয়ার্কশপ হয়েছে আমি একটাও ছাড়িনি।'

সঠিক প্রশিক্ষণ মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয় তা রবীন্দ্রনের জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এতদিন তাঁর যেসব কাজ ছিল সাধারণ মানুষের বিস্ময়ের কারণ তাঁর হয়ে উঠল দেশ-বিদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচকদের আগ্রহের বিষয়। বেশ কয়েকটি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার এখন তাঁর বাড়ির ক্যাবিনেটে শোভা পায়। ২০০৬ সালে পেলেন এক বিরল সম্মান। কেরল বনসাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত করা হলো তাঁকে। সে বছরই বোধিবৃক্ষের বনসাই তৈরি করার জন্য পেলেন অভিজাত ইয়াসাকি পুরস্কার।

রবীন্দ্রনের বাগানের নাম নিকি বনসাই। তামিলনাড়ুর পদ্মনাভপুরম প্যালেসের কাছেই। সেখানে গেলে আপনি দেশবিদেশের চিত্রবিচিত্র বনসাইয়ের মেলায় হারিয়ে যাবেন। পিপল, কলা, বোগেনভিলিয়া— কী নেই তাঁর সংগ্রহে। তামিলনাড়ু থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁর বাগানে আসেন। কেউ শেখেন, কেউ আবার শুধু দেখেন। রবীন্দ্রনের কোনও ক্লান্তি নেই। কখনও কখনও শেখাতে গিয়ে দিন কেটে যায়। বনসাইয়ের হাজারও রঙের শেষ বিন্দুটি শিক্ষার্থীদের মনে ছড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত তিনি হাল ছাড়েন না। ■

শোক সংবাদ

পরলোকে প্রবীণ স্বয়ংসেবক বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 'কীর্তিযস্য স জীবতি'। গত ১৫ জানুয়ারি সকাল ৭-৪০ মিনিটে নিজ বাসভবনে স্বল্প রোগভোগের পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের কোলে ঠাঁই পেলেন কলকাতার পূর্ব-পুটিয়ারীর গঙ্গাপুরীর 'গীতা মন্দিরের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণপুরুষ সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিনয় ভূষণ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন সার্থকনামা বিনয়ের অবতার সদা হাস্যময় সর্বভূত হিতে রত। তাঁর পিতৃদেব প্রাক্তন পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এলাকায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। আমৃত্যু ব্রহ্মচারী বিনয় বাল্যকালেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। সঙ্ঘের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শিক্ষিত বিনয় স্বর্গীয় একনাথ রানাডের স্নেহধন্য ছিলেন। একনাথজী বিনয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলায় মন্দির নির্মাণের সময় তিনি নির্মাণ কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বেশ কয়েক মাস কন্যাকুমারিকায় গিয়েছিলেন। দেশভাগের পর পূর্ব পুটিয়ারীর গঙ্গাপুরী এলাকায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের এক বড় বসতি গড়ে ওঠে। এলাকায় কোনো দেবস্থান নেই এটা কিশোর ধর্মপ্রাণ বিনয়কে পীড়া দিত। শ্রীমদ্‌ভগবত গীতা এবং পার্থসারথী কৃষ্ণভক্ত বিনয় এলাকায় একটি পার্থসারথি মন্দির নির্মাণের সঙ্কল্প নেয়। যোগাযোগ করেন শ্রদ্ধেয় বৈদান্তিক প্রয়াত আমূলপদ চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক ড. সীতানাথ গোস্বামী, গুজরাটি বৈদান্তিক প্রয়াত কেশবলাল মেহতা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে। সৃষ্টি হয় 'গীতা সমাজ উন্নয়ন সঙ্ঘের'। কেশবলাল মেহতা কলকাতার গুজরাটি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গুপ্তদান হিসেবে অর্থ জোগাড় করলেন এবং স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মানুষদের অর্থানুকূল্যে এলাকায় জমি কিনে নির্মাণ হয় গীতা মন্দির। মন্দিরে পার্থ সারথির অতি সুন্দর মূর্তি রাজস্থান থেকে আনা হলো। মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুরীর জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য এসেছিলেন পূর্ব- পুঁটিয়ারীতে। সে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। সেই থেকে মন্দিরে নিয়মিত গীতা পাঠ চলছে। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আরম্ভ করে বাংলার বিভিন্ন মঠ মিশনের সন্ন্যাসীদের এনে মন্দিরে ধর্মসভার নিয়মিত ব্যবস্থা করা হয়। বাংলার বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিত্ব এই মন্দিরে এসেছেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন।

এই মন্দিরের প্রাণপুরুষ বিনয়ের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বহু মানুষ তাঁর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিনয়ের বড়দা বিজয় কুমার চক্রবর্তী সঙ্ঘের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা এবং দক্ষিণ কলকাতা ভাগ সঙ্ঘচালক ছিলেন। মৃত্যুকালে বিনয় আত্মীয় পরিজন এবং বহু গুণমুগ্ধ মানুষ রেখে গেছেন।

* * *

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গে প্রান্ত সমিতির সদস্য পুটিমারী সারদা বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক তথা মাথাভাঙ্গা প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক প্রভাতচন্দ্র রায় ও সাধন কুমার রায়ের মাতৃদেবী সুমিষ্ঠা রায় গত ২২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৬ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

নদীয়া জেলার পলাশী শাখার স্বয়ংসেবক রথীন ভট্টাচার্যের মাতৃদেবী শোভারানি ভট্টাচার্য গত ২১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

গত ২৬ জানুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দৌলতপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা জেলা ধর্মজাগরণ প্রমুখ বভ্রুবাহন মণ্ডলের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে তাঁর পিতা দীপক মণ্ডল মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন উত্তরবঙ্গ আরোগ্য ভারতীর দায়িত্বপ্রাপ্ত অমিয় মাহাত'র হাতে। অনুষ্ঠানে বিভাগ শারীরিক প্রমুখ মৃণাল মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২৬ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর সহ-নগর কার্যবাহ সত্যপ্রতাপ সিংহের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে তাঁর পিতা তারকেশ্বর নগর ব্যবস্থাপ্রমুখ ভানুপ্রতাপ সিংহ মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২৪ জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলা সেবাপ্রমুখ শিশির গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রিয়ার শুভ বিবাহের অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২৮ জানুয়ারি বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ সুপ্রভাত বরাট তাঁর বড় পুত্র স্বয়ংসেবক সায়ন্তন বরাটের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বতন বাঁকুড়া জেলা প্রচারক শ্রীকান্তনন্দী-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। ■

এস্কিমোদের দেশে

এস্কিমো নামটা আমরা অনেকেই জানি। এরা উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাস করে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই এই অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। এখানে নিয়মিতভাবে দিন-রাত্রি হয় মাত্র চার মাস। বাকি আট মাসের মধ্যে চার মাস দিন, চার মাস রাত্রি। এখানে চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। নদী, হ্রদ, সমুদ্র সব জমে যায়। কোনও গাছপালা নেই। নেই সবুজের কোনও চিহ্ন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড়। শীতকালই এখানে প্রধান। রক্ত জমে যাওয়া কনকনে ঠাণ্ডা। গরমকাল আসে খুব কম সময়ের জন্য। ওদের গরমকাল মানে আমাদের পৌষ-মাঘের শীত। তখন বরফ গলে যায়। নদী সমুদ্রে চলে জলের প্রবাহ। সেই জলে সাঁতার কাটে সিল, সিন্ধুঘোটকের দল।

উত্তর মেরুর আরও একটি আকর্ষণ হলো সাদা ভল্লুক। পৃথিবীর আর কোথাও এর দেখা মেলে না। এরকম একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে যারা বাস করে তাদের এস্কিমো বলা হয়। গরমকাল এলেই এরা শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। আর শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ঢেকে যায় তখন তারা এক ধরনের ঘর বানায়। এই ঘরগুলোকে বলে ইগলু। দেখতে অনেকটা উল্টো কড়াইয়ের মত। দুই ধরনের বরফ দিয়ে এই ইগলু তৈরি হয়। অস্বচ্ছ বরফ দিয়ে তৈরি করে ঘরের দেওয়াল। স্বচ্ছ বরফ দিয়ে তৈরি করে জানালা। বাইরে যতই হাড়হিম করা ঠাণ্ডা পড়ুক না কেন, ভিতরে কিন্তু এই ঘরগুলি ততটা ঠাণ্ডা হয় না।

সিলের চর্বি জ্বালিয়ে এরা আলোর ব্যবস্থা করে। ব্যবহার করে পশুর চামড়ার পোশাক। তবে এ অনেক বছর আগের কথা। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এস্কিমোদের জীবনযাত্রাতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। আজ থেকে আড়াইশো-তিনশো বছর আগে এই অঞ্চলটি ছিল অজানা রহস্যে ঘেরা। সেখানে কারা থাকে, তাদের জীবনযাত্রা কেমন, জায়গাটি দেখতে কেমন তা কেউ জানত না। দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা বারবার চেষ্টা করেছে সেখানে পৌঁছতে। কখনো জাহাজে চেপে, কখনো বা পায়ে হেঁটে। কোনও কোনও অভিযাত্রী চিরতরে হারিয়ে গেছে সেই তুষার রাজ্যে। এখন অবশ্য সেই অসুবিধা নেই, হেলিকপ্টারে চেপে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। এস্কিমোদের নিজস্ব কোনও দেশ নেই। নরওয়ে, আইসল্যান্ড, আলাস্কা, ফিনল্যান্ড এইসব দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা। স্থানভেদে এস্কিমোরা অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যেমন গ্রিনল্যান্ডে যারা থাকে তাদের বলা হয় ইনুইট। আবার আলাস্কার এস্কিমোরা ইউপিক, আলেউত নামে পরিচিত। যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত এই এস্কিমোরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে স্থায়ী কোনও জায়গায় বসবাস করে না। শিকারের খোঁজে তারা এক বরফ রাজ্য থেকে আরেক বরফ রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বর্তমানে তারা যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে অনেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। শান্তিতে, নির্বিঘ্নে জীবন কাটাচ্ছে। পড়াশুনা করে উচ্চশিক্ষিত হয়ে যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন কাজকর্মে। নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। তবে সাইবেরিয়াতে যে এস্কিমোরা থাকে তাদের একটি গোষ্ঠী এখনো আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তারা তাদের প্রাচীন জীবনযাত্রাকে আগলেই বেঁচে আছে।

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

ভীমবেটকা

ভীমবেটকা কথার অর্থ হলো ভীমের বৈঠক স্থল বা ভীম যেখানে উপবেশন করত। ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগের নথিতে এই স্থানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৮৮ সালে, বৌদ্ধ মঠ জাতীয় কিছু হিসেবে। পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় এই অঞ্চলটি থেকে প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির প্রমাণ মিলেছে। বিশ্বের প্রাচীনতম পাথরের মেঝে ও দেওয়াল এখানেই মিলেছে। মধ্যপ্রদেশের রায়সেন জেলায় বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ ঢালে ঘন অরণ্যে ভীমবেটকার অবস্থান। এখানে আবিষ্কৃত গুহাবসতি ও গুহাচিত্রগুলি প্রায় ৩০ হাজার বছরের প্রাচীন। সাড়ে সাতশোর বেশি গুহাবসতি আবিষ্কার হয়েছে। গুহায় অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রাকৃতিক রঙে আঁকা। ২০০৩ সালে ইউনেস্কো ভীমবেটাককে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে।

জানো কি?

- রজার ফেডেরার ২০টি গ্রান্ডস্লাম জিতেছেন।
- বিয়ন বর্গ ৫ বার উইম্বলডন জিতেছেন।
- সব ধরনের ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকরের ১০০টি সেঞ্চুরি আছে।
- ফুটবল সম্রাট পেলের ১০০০ এর বেশি গোল করার কৃতিত্ব রয়েছে।
- প্রথম মাউন্ট এভারেস্ট জয়ীর নাম তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারি।
- মিহির সেন প্রথম ভারতীয় সাঁতারু যিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন।
- ১৯৬২ জাকার্তা এশিয়াডে ফুটবলে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ভারত।

ভালো কথা

রামুর ঠাকুমার পশু-পাখি প্রেম

রামুদের বাড়িতে ১২টি কুকুর ও ৯টি বেড়াল আছে। রামুর ঠাকুমা ওদের খুব ভালোবাসে। এতগুলো কেন জিজ্ঞেস করতে ঠাকুমা বলল 'আমি পশুপাখি ভালোবাসি। তাই আমাদের বাড়িতেই ওরা আশ্রয় নেয়। লোকেরা রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেলেই আমি ওগুলোকে বাড়ি নিয়ে আসি।' রামুর ঠাকুমা কাকও ভালোবাসে। দুপুরে খেয়েদেয়ে দুই দলা ভাত নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কা কা, আয় আয় বলতেই কয়েকটা কাক উড়ে এসে ঠাকুরমার হাতে থেকে ভাতের দলা নিয়ে যায়। আমার দিকে তাকিয়ে ঠাকুমা বলে, ভগবানের জীব তো, ওদের ভালোবাসতে হয়।

রাজন্যা ওঝা, অষ্টম শ্রেণী, হুটমুড়া, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

আমার গ্রাম

অর্ঘ্যদীপ দে, চতুর্থ শ্রেণী, পূ: পাঁচিয়ার, প: মেদিনীপুর

ছোট্ট আমার গ্রামখানি
গুটিকয়েক ঘর,
তারই মাঝে গ্রামের মানুষ
মিলেমিশে রয়।
চারিদিকে খালবিল
আছে লতাপাতা,
সারি সারি বাঁশগাছ
শুধু পাতাই পাতা।

সকাল সন্ধ্যা কিচির মিচির
করে পাখির দল,
বর্ষাকালে পুকুরেতে
মাছগুলো হয় চঞ্চল।
আরও আছে ধানের জমি
বক সারি সারি
তাইতো আমি গ্রাম ছেড়ে
থাকতে যে না পারি।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

SURYA ROSHNI LTD & SURYA FOUNDATION

Tel. : 011-25262994, 25253681   Website : www.suryafoundation.net.in

Surya Foundation is a renowned organisation for imparting training to the youth for their all-round development. We require the following categories of dedicated & diligent youth brought up in sound **SANGH** culture with impeccable character and interested in social and professional work for entry in **SURYA ROSHNI LTD** and **SURYA FOUNDATION**. Candidates will be put through an interview process prior to their selection.

Posting will be given after successful completion of 3 months initial training at Surya Training Campus followed by one year On Job Training (OJT).

Categories & Salary

Post	Experience	Salary during Training & OJT	CTC after OJT
CA	IPCC / Intermediate	3 - 3.5 L Per Annum	As per Performance
	Fresher	5 - 6 L Per Annum	- do -
	5 years	7.5 - 9 L Per Annum	- do -
	10 years & above	9.5 - 12 L Per Annum	- do -
Engineer	B.Tech. (IIT)	7.5 - 9 L Per Annum	- do -
	B.Tech. (NIT)	4.5 - 5 L Per Annum	- do -
	B.Tech. (Others)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
MBA	IIM	6 - 7.5 L Per Annum	- do -
	Other Institutes	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
Mass Communication (Media)		2.4 - 3 L Per Annum	- do -
MCA, **B.Ed, M.Ed., MSW, M.Sc., M.Com., M.A.** *(Freshers / Experience)*		2 - 3 L Per Annum	- do -
B.Com. with three years experience in accounts, purchase, store		2 L Per Annum	- do -
B.Sc. BCA, BBA, BA, B.Com.		1 L Per Annum	- do -

Application Form

(Apply on a separate sheet of paper)

Affix latest Photograph here

Full Name (In Capital) __________ Date of Birth _____ Caste ________ Married / Single ___

Father's Name ____________________ Father's Occupation _________ Monthly Salary _____

Brothers (Excluding Self) _______ Sisters ________________

Educational Qualification_______________________________ (Attach Photocopy of Marksheet)

Have you attended NCC/NSS/OTC/ITC/Sheet Shivir? Give Details of location of Camp and dates ____________

Were you associated with Seva Bharati / Vidya Bharati / Vanvasi Kalyan Ashram / Any other Sangh Project? Give details.

Is anyone known to you in Surya Family? Give his name and department _______________________________

Have you ever been Interviewed in Surya Foundation? If yes, give Year and Cadre for which Interviewed. ____

Address for Correspondence _________ Pincode ______ Phone No. ____ Mobile __________ Email _________

Give details of any special achievements, qualifications etc.

Apply with detailed CV along with the application at the following address or Email : **suryainterview@gmail.com.**

Surya Foundation : B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063

Apply within two months of the publication of the advertisement

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
12 February - 2018 - Rs. 10.00

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. || দাম ১০ টাকা ||